সাজেনা

সৈয়দ শামসুল হক

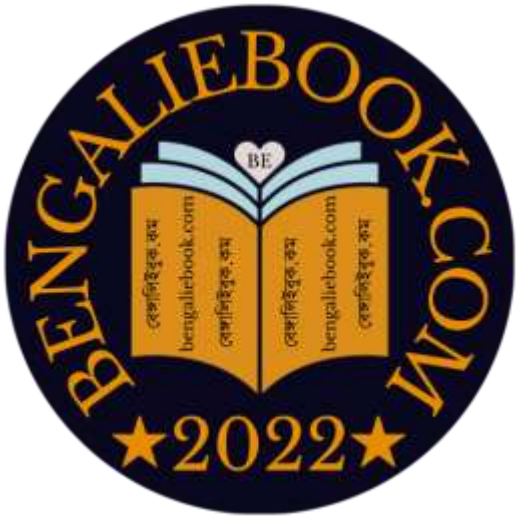

সূচিপত্র

১. সারারাত যেন ঘুম আসে না আনুর.....2

২. সকাল বেলা উঠেই আজ গোসল.....18

৩. টিফিন পিরিয়ডে একটা ছেলে.....35

৪. এত সুন্দর দোতলা বাড়ি.....53

৫. সকালবেলার লাল আলো.....69

৬. ট্রেনটা হুস-হুস ঝকঝক করতে করতে.....92

৭. ছিপটা নিয়ে সহজে বেরোনো হয় না.....116

৮. আনু এখন বড় হয়ে গেছে.....142

৯. তিনদিন পরে রাত আটটার গাড়িতে.....160

১০. গীর্জার পুকুরটা ঘন গাছপালায় ঘেরা.....172

১১. সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে.....200

১. সারারাত যেন ঘুম আসে না আনুর

সারারাত যেন ঘুম আসে না আনুর। ট্রেন কখন মহিমপুর পৌঁছুবে সেই ভাবনা তার। হুট করে স্টেশন আসে, ঘুরঘুটি অন্ধকারের মধ্যে প্ল্যাটফরমে ভূতের মতো মানুষগুলোকে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। একটা টেমি হাতে কে ডাকতে ডাকতে চলে যায়– চাচা, চাচাগো, কোথা থেকে যেন খট খট ঘটাং ঘটাং শব্দ উঠতে থাকে, আনু জিগ্যেস করে– হ্যাঁ বাবা এসে গেছি আমরা?

আরে না। তোর ঘুম নেই লক্ষ্মীছাড়া। ঘুমো।

কিন্তু আনু ভয় পায় না। বাবা অমন ধমক দিলেও সে শুয়ে পড়ে না। জানে বাবা ঐ রকমই, তাকে কিস্‌সু বলবেন না। সান্তাহারে তিনঘণ্টা বসে থাকবার পর যখন গাড়ি এলো, বাবা বলেছিলেন, এইবার আমরা এসে গেছি। সেই কথাটা শুনে অবধি আনুর ঘুম গেছে। নইলে তার আগে চমৎকার ঘুমোচ্ছিল সে মার পাশে ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে। শোবার আগে বাবা মিষ্টি কিনে এনেছিলেন এক হাঁড়ি। দুটোর বেশি খেতে পারে নি।

ট্রেনে কিস্‌সু খেতে পারে না আনু। বাবার সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরেছে সে। বাবার শুধু বদলির চাকরি। বদলিটা খুব পছন্দ আনুর, কেবল চাকরিটা একেবারেই ভালো লাগে না। কত ছেলের বাবা ডাক্তার, উকিল, সার্কল অফিসার, কত কী!–আর কেবল তার বাবাই কোথা থেকে বেছে বেছে দারোগা হয়েছেন। ছেলেরা ঠাট্টা করে; বলে–দারোগার ব্যাটা,

পালা পালা, ধরে হাজতে নিয়ে যাবে। আনুব তখন জেদ হয় খুব। একেকবার ছেলেগুলোকে ধাওয়া করে; যেন সত্যি সত্যি ধরবে। কিন্তু একি; সবাই ভয় পাওয়া দূরে থাক, একটু দৌড়ে গিয়েই খিলখিল করে হাসতে থাকে। তখন আনু বুঝতে পারে, তার কোনো জোর নেই, কিছু নেই। সে একা।

একেকদিন বাড়িতে এসে ধুপধাপ করে এটা ফেলে, ওটা সরায়, পরে মার কাছে গিয়ে বলে মা, তুমি বাবাকে আর থানায় যেতে দিও না।

কেন রে?

মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করেন কাঁধ থেকে ধোয়া ভিজে কাপড়গুলো তারে মেলে দিতে দিতে। একটা কাক খা-খা করতে থাকে রান্নাঘরের চালে বসে। পর মুহূর্তেই মা ভ্রূকুটি করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন কাকটা। তিনি বোধহয় আনুর অবাক-করা কথাটা ভুলেই যান। আনু তখন হাতের কঞ্চিটা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলে, হ্যাঁ মা দিও না। ডাক্তার সাহেবের বৌ বলে, দারোগার ছেলে খারাপ। লাট্টুকে আমার সঙ্গে মিশতে না করে দিয়েছে।

মা-র হাতটা থেমে যায়। একটু চুপ করে থাকেন তিনি। আনুর দিকে তাকিয়ে দেখেন। তারপর হেসে ফেলেন। তখন আনুর রাগ হয় খুব। বলে, না আমি শুনবো না। লাট্টুর মা বলে কেন?

বলুক গে তুই আর যাসনে। নে, কাপড়টা ধর।

আনু একগাদা কাপড় কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনও ঘ্যানঘ্যান করে, তুমি বাবাকে বলো কিন্তু মা। কত ছেলের বাবা কত ভালো চাকরি করে।

কিন্তু বদলিটা পছন্দ। কত দেশ দেখা যায়। ইস, কত জায়গায় গেছে আনু। একেকদিন ছেলেদের মধ্যে তার খাতির হয়ে যায় ভারী। তাদের সে গল্প শোনায়। নিজেকে বড় বাহাদুর মনে হয় তার। রেললাইনের পাশ দিয়ে আসবার সময় সে হয়তো ভয়ে ভয়ে বলেছে—-এই জঙ্গলে ভাই বাঘ থাকতে পারে। তখন আনু সগর্বে ঘোষণা করে, বাঘ এলে রেললাইন দিয়ে আমি দৌড়ুবো। একেবারে চলে যাবো নাটোর; আবার দৌড়ুবো, আবার রাজশাহী, আবার দৌড়ে দৌড়ে আদমদিঘী চলে আসবো—-বাঘ আমাকে ধরতেই পারবে না।

ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এক দৌড়ে যে এখান থেকে রাজশাহী যাওয়া যায় না, এখান থেকে অনেক দূর—- তা কারো খেয়াল হয় না। যেন সত্যি সত্যি আনু তা পারবে। তাদের চোখের সামনে ছায়াবাজির মতো অস্পষ্ট একেকটা শহরের ছবি ভেসে ওঠে। জলজলে রোদ, ঝিমঝিম দুপুর তারা কল্পনায় দেখতে পায়। বুনো পাখি ডাকছে করর ঠক্ করর ঠক্, গরুর গাড়ি যাচ্ছে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করতে করতে, কাঁচামিঠে আম ধরেছে বড় বড়—- আনুকে তাদের অন্যজগতের মানুষ মনে হয়।

আবার আরেকদিন হয়ত বিকেলে ঝিমিয়ে থাকা রেলস্টেশনে ওরা খেলতে আসে। সারা স্টেশন ফাঁকা। মিষ্টির দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ। গাড়ি একটা আসবে সেই রাত দশটায়। গুদামের পাশে কয়েকটা মালগাড়ি দাঁড়ানো। গুদামে পাটের বস্তা পাহাড়ের মতো উঁচু। ওজন করবার কলটা দেখতে যেন বিরাট বিদঘুটে একটা সেলাইয়ের মেশিন। দাঁড়ানো দুটো একটা এই রকম মালগাড়ি যেন পেটে কত দেশবিদেশের রহস্য পুরে চুপ করে আছে। আনু তাদের গায়ে খুব সন্তর্পণে হাত রাখে এত আস্তে, যেন ওগুলো একেকটা মানুষ। আদর করে। বানান করে করে পড়ে গায়ের লেখাগুলো–ই, বি, আর। রেলের গাড়িটার গায়ে লেখা নট টু বি লুজ শান্টেড। মানে বুঝতে পারে না। একটা মালগাড়ির গায়ে সাদা একটা চাকা বসানো—-যেমন মোটর গাড়িতে দেখা যায়। কেউ ওতে হাত দিতে গেছে হয়ত, লাফ দিয়ে তার হাত সরিয়ে দেয় আনু। উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপতে থাকে। সে ছাড়া আর কেউ তো জানে না, ওটা হচ্ছে ব্রেকের চাকা। ঘোরালেই ব্রেক খুলে যাবে, গাড়ি তখন ছাড়া পেয়ে হুস্ হুস্ করে ছুটতে থাকবে, সান্তাহার পার্বতীপুর কোথায় চলে যাবে, কেউ থামাতে পারবে না। ছেলেরা অবাক হয়ে সাদা চাকাটা দেখে। কেউ বলে—- যাঃ, ইঞ্জিন না হলে যাবে কী করে? আনু জবাব দেয় গম্ভীর হয়ে, ইঞ্জিনই সব নাকি? বাবার সঙ্গে ইঞ্জিন ছাড়াও গাড়ি দেখেছি কত।

হবেও বা। আনু কত জায়গায় ঘুরেছে, কত দেখেছে, ওরা তো আর কোথাও যায়নি! আনুর তখন গর্ব হয় খুব। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা নিস্পৃহতা জাগে তার ভিতরে। পরম উদাস কণ্ঠে সে বলে, জানিস আমরা এখান থেকেও চলে যাবো। বাবা খুব শীগগীর বদলি হবে।

কোথায় রে?

চট করে কোনো জায়গার নাম মনে পড়ে না আনুর। তার পানু ভাই থাকে ঢাকায়। ঢাকায় থেকে পড়ে। আনু এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অবলীলাক্রমে বলে, ঢাকায়।

ইস। ঢাকা যাবি ভাই?

হ্যাঁ, না তো কী? দেখিস।

এবার আনুর বাবা বদলি হলো মহিমপুরে। বাঁধাছাঁদা করবার সময় বাবা মাকে বলেছিলেন, ছেলেমেয়েগুলোর কিছু লেখাপড়া হলো না। বছরের শেষে বদলি। না এখানে পরীক্ষা দিতে পারল, না ওখানে গিয়ে নতুন ক্লাশে ভর্তি হতে পারবে।

তিনি বড় বড় ছালার মধ্যে হাড়ি বাসন রুটি বেলবার বেলন, ভাঙা একটা বেতের বাক্স, আধমণ পেঁয়াজ ভরে চলেছেন। তাঁর হাতের আর কামাই নেই। বড় আপা সাহায্য করছে মা-কে। আর কারো দেখা নেই। না মেজ আপা, সালু আপা, ডালু আপা কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আর ওরা সব ওদের বন্ধুদের কাছে গেছে। চলে যাচ্ছে কিনা! গলা ধরে ধরে গল্প করছে।

বাবা লেখাপড়া নিয়ে দুঃখ করেছিলেন। কিন্তু আনু ভেবেই পায় না দুঃখ করবার কী আছে! খামকা তার মন খারাপ করে দিতে পারেন বাবা! কেন, পানু ভাই ঢাকায় পড়ছে।

সে এবার ক্লাশ ফোরে পড়ছে। গত বছর সেকেণ্ড হয়েছিল না সে? মাস্টার মশাই বলছিলেন প্রাইজ দেবে আনুকে। তা এখান থেকে চলে গেলে, আর কে আসবে প্রাইজ নিতে? এতে যা একটু মন খারাপ হয় আনুর। আর বড় আপার তো পড়া শেষ হয়ে গেছে। তার বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ের জন্য বাবা কত চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, লেখাপড়া একেবারে করে না মেজ আপা। এত ফাজিল হয়েছে। খালি গল্প, গান আর পাড়া বেড়ানো। মাকে পর্যন্ত একটু কাজ করে দেয় না।

বাবা বলেন, আনু, হোন্ডলটার ওপর চেপে বসতো বাবু।

লাফিয়ে চড়ে বসে আনু। খুব করে জাততে থাকে। বাবা কষে টান লাগান চামড়ার স্ট্যাম্প ধরে। ঘামে তার মুখটা ভিজে ওঠে। বলেন, ভেতরে কটা বালিশ দিয়েছিস, অ্যাঁ?

সেই মহিমপুরে আসা।

ভোর বেলায় গাড়িতে উঠেছিল। কারু সঙ্গে দেখা হয়নি আনুর। ছেলেদের বলে দিয়েছিল ইস্টিশানে আসিস ভাই। কিন্তু স্টেশনে এসে তাদের মনে পড়ে নি। স্টেশনে এলেই আনু যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। সব কিছু ভুলে যায়। বুকের মধ্যে কেমন শিরশির দুপদুপ করতে থাকে। কোথাও যাবার জন্যে আনুর মনটা হুহু করে ওঠে। যেন এক মুহর্ত বসে থাকা যাবে না, থাকলে পৃথিবীর কত কী যেন সে আর দেখতে পাবে না; যেন পৃথিবী কোথাও একটা বিরাট মজাদার মেলা খুলে তাকে ডাকছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলো আনু। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে গাড়িটা থেমে আছে। একটা ইস্টিশান। ভোরের আবছা আলোয় কেমন বৃষ্টি ধোয়া মনে হচ্ছে। দূরে একফালি ঘন বনের মাথায় জমেছে মিহি কুয়াশা। প্ল্যাটফরমে পোড়া কয়লা দেখাচ্ছে ভিজে ভিজে।

ওঠ, ওঠ, মহিমপুর এসে গেছে দ্যাখ।

বাবা তাকে একটানে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। তারপর গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে কুলি ডাকেন। কিন্তু তার আগেই দুজন সেপাই এসে দাঁড়ায়। সালাম করে। আর একটু পরেই আসে আরেকজন। আনু তার পোশাক দেখে, মাথার টাক দেখে, গোঁফ দেখে, কেমন করে যেন বুঝতে পারে, এ হচ্ছে বড় জমাদার।

মেজ আপা আনুকে ডেকে ফিসফিস করে বলে, আমার আরেক জোড়া স্যাণ্ডেল কোন্ ট্রাঙ্কে আছে, জানিস ভাই?

আনু অবাক হয়ে তাকায়। বুঝতে পারে না। বলে, কেন?

দেখ না, এটার ফিতে ছিঁড়ে গেছে।

মা বুঝি শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি ঝামটা দিয়ে উঠলেন, এখন কে তোর স্যাণ্ডেল বার করবে?

বারে আমি যাবো কী করে?

খালি পায়ে যাবি। কে দেখতে আসছে তোকে?

কাঁদো কাঁদো হয়ে যায় যেন মেজ আপা।

বাবা নিচে নেমে গেছেন। সেখান থেকে দরোজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কী বলতে এসেছিলেন, মার কথা শুনে বললেন, আহা, আবার কি হলো?

মা তার জবাব না দিয়ে ঘোমটা টেনে দিলেন ভালো করে। এখন তাকে নামতে হবে। সবার আগে লাফ দিয়ে নামে আনু। সবাই যখন নেমে আসে আনু দেখে মেজ আপা সালু আপার স্যান্ডেল জোড়া পায়ে দিয়েছে। আর সালু আপার পা খালি।

একটা গরুর গাড়ি এসেছে। ওতে সব মালপত্র যাবে। আর এই টুকুন তো পথ। রেল লাইনের ধারে ধারে হেঁটে গেলে আধমাইলও নয়। হেঁটে যাবে সবাই। জমাদার সাহেব বললেন, নাকি স্যার, আরেকটা গাড়ি ডাকব? মেয়েরা রয়েছে।

না, না, তার দরকার হবে না। বরং দিব্যি একখানা মর্নিং ওয়াক হয়ে যাবে। কী বলিস? বলতে বলতে সবার উপরে স্মিত মুখ ঘুরিয়ে আনলেন বাবা। তারপর জমাদার সাহেবকে বললেন, তাহলে আমি বরং এখানেই ফজরের নামাজটা পড়ে নেই।

ঠিক তখন বেজে উঠলো গার্ডের বাঁশি। হুস হুস করে চলতে শুরু করল ট্রেন। ঝকঝক করে আঁধারের মধ্যে গাড়িটা দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। প্ল্যাটফরমে পড়ে রইলো ছড়ানো বাক্স প্যাটরা, সুপুরির বস্তা, পোস্টাফিসের ব্যাগ, মাছের বাক্স। আনু একেবারে প্ল্যাটফরমের শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে গেল বড় আপার সঙ্গে।

আনুর সবচেয়ে ভালো লাগে বড় আপাকে। সারাক্ষণ যেন কী ভাবে বড় আপা, যেন কত দুঃখ ওর মুখটা একেবারে কালো আর এইটুকু করে রাখে। আনুকে কোনদিন বকে না, মারে না, আনুর জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ি করে না। সারাক্ষণ বড় আপার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে আনুর। আনু যখন বড় হবে, যখন তার নিজের বিরাট বাড়ি হবে, যখন তার অনেক টাকা হবে তখন বড় আপাকে সে অনেক কিছু বানিয়ে দেবে, তার সঙ্গে রাখবে। কতদিন ক্লাশে যখন পড়া ভালো লাগেনি, তখন মনে পড়ে গেছে বড় আপার কথা। বসে বসে আনু তখন স্বপ্ন দেখেছে বড় আপাকে নিয়ে। দেখেছে, আনু বড় হয়ে গেছে। বড় আপার মুখখানা হাসিতে খুশিতে ফর্সা লাল দেখাচ্ছে। কোনো কিছুর অভাব নেই। সবাই ওদের দিকে দেখিয়ে বলছে—-ওরা কত সুন্দর!

ফিরে এসে দেখে নামাজ শেষে মোনাজাত করছেন বাবা। ভোরের আলোয় তার মুখ এত শান্ত দেখাচ্ছে যেন একটা ছবি দেখছে আনু। বাবা মোনাজাত শেষ করেই দেখতে পেলেন আনুকে। উঠে আনুর মাথায় মুখে সেই হাত দুটো মাখিয়ে দিয়ে বললেন, চল।

ওরা স্টেশন ঘরের ভেতর দিয়ে বেরুলো না। ট্রেনটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকের লাইন ধরে হাঁটতে লাগল সবাই। বাবা গল্প করতে লাগলেন জমাদার সাহেবের সঙ্গে।

পেছনে মা বড় আপা মেজ আপা সালু আপা ডালু আপা। আর একেবারে শেষে আনু। আনু এর মধ্যে ভাব করে ফেলেছে সেপাইয়ের সঙ্গে। একজন গেছে মালের সঙ্গে গরুর গাড়িতে। আরেকজন তাদের পেছনে চলেছে। আনু জিগ্যেস করে গম্ভীর গলায়, হাঁ সেপাই, তুমি এই থানায় কাজ করো?

জি খোকা বাবু।

কী নাম তোমার?

ইয়াসিন আছে।

তুমি বেহারি?

ভ্রু কুঁচকে আনু জিগ্যেস করে। কিন্তু ভারী মজা লাগে তার কথা বলবার ঢং। আর কী মোটা গোঁফ, দুটো আমপাতার মতো বড় বড়। ইয়াসিন হেসে ফেলে। আবার তেমন জোরে হাসে না, সামনে হুজুর যাচ্ছেন যে! গলা নামিয়ে বলে, হাঁ বেহারি তো আছি খোকাবাবু। ফিন বেহারি নাই। এখন বাঙ্গালি আছি আমি। এহি হামার মুলুক আছে।

তুমি ছাতু খাও?

ও ভি খাই তো। এখন তো মাছ খায় খোকাবাবু। আমি একরোজ পকায়ে দিব, আপনি খাবেন, মা ভি খাবেন, বোলবেন কী রকম কে কভি খায় নাই। হাঁ।

শুনে ডালু আপা খিলখিল করে হেসে উঠে। মার আঁচল টেনে বলে, মা দ্যাখো আনু সেপাইটার রান্না খাবে।

ওর তো খালি ঐ সব।

চলতে চলতে মা তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেন। আনু তখন খুব গম্ভীর হয়ে চলতে থাকে। পথ থেকে একটা কঞ্চি কুড়িয়ে নেয়। সেটা দিয়ে ভোরের শিশিরে ভিজে থাকা লজ্জাবতীর দল ছোঁয়। কেমন আস্তে বুজে আসে ওরা। আনু পিছিয়ে পড়ে সবার থেকে।

রেল লাইনের পাশে এত লজ্জাবতী যে বিস্ময়ে আনু সব কিছু ভুলে যায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। একটাকে বোজায়, আবার আরেকটা অমনি রেখে দেয়। আর থানকুনি গাছ কত! পয়সার মতো গোল গোল পাতাগুলো থিরথির করে কাঁপছে ভোরের বাতাসে। এত থানকুনি গাছও একসঙ্গে আগে আর দেখেনি আনু। এখন ভাবনা কী? মা যদি ফোঁড়ার ওষুধ করতে চান তো আনু একদৌড়ে এক কোচড় থানকুনি এনে দিতে পারবে।

আনু, ও আনু।

বাবা সামনে থেকে ডাক দেন। অনেক পিছিয়ে পড়েছে সে। আনু দৌড়ে এসে বাবার হাত ধরে। বলে, কী বাবা?

জমাদার সাহেব বলেন, এই বুঝি আপনার ছোট ছেলে?

হ্যাঁ। ক্লাশ ফোরে পড়ছে। ভেরি শার্প অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট।

আনু বুঝতে পারে তার প্রশংসা করছেন বাবা। সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। জমাদার সাহেব অকারণে নিঃশব্দে হাসতে থাকেন। বাবা বলেন, আর আমার ছোট মেয়ে মিনু, সে সঙ্গে নেই। ওদের মামা এসেছিল নিয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে এসে পড়েছে ওরা। সিগন্যালের পাশ দিয়ে ডানে রাস্তা নেবে গেছে। সেই রাস্তা ধরলো ওরা। রাস্তার দুপাশে পাতলা বাঁশ-বন। একটুখানি হাঁটতেই বড় রাস্তা এসে গেল। বড় রাস্তার ওপরেই থানা।

হালকা লাল রং। আবার ছাদের কাছে শাড়ির পাড়ের মতো নীল রেখা। তাইতে খেলনা বাড়ির মতো দেখাচ্ছে। সামনে শান বাঁধানো বিরাট বারান্দা। বারান্দার নিচে মাঠ। থানার বামে কোয়ার্টারগুলো। ওরা এসে দেখল গরুর গাড়িটা তখনো এসে পৌঁছয়নি।

থানা থেকে ছোট দারোগা সাহেব বেরিয়ে এলেন। এসে বাবাকে আদাব করলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে গেলেন নিজের বাসায়।

আমার এখানেই ছেলেমেয়েরা নাশতা করে নিক স্যার। একটু আরাম করুক।

বাবা তার সঙ্গে চলে গেলেন থানা দেখতে।

কোনো নতুন বাড়ির ভেতরে এলে আনু একেবারে চুপসে যায়। দারোগার বৌ সবাইকে বসতে দিলেন ঘরে। আনু চুপ করে এককোণে মায়ের পাশে চোখ নামিয়ে বসে রইলো। মা বললেন, মেয়েরা হাতমুখ ধোবে ভাই।

যাক না, কুয়োতলায় পানি তোলাই আছে। যাও তোমরা।

ছোট দারোগার বৌ আঙ্গুল তুলে পথ দেখিয়ে দিলেন। মা বললেন, আনু, যা না সঙ্গে।

আনু যেন বেঁচে গেল। একলাফে বাইরে এসে দাঁড়ালো সে। তার পরে এলো বড় আপা ওরা।

কুয়োতলায় উবু হয়ে বসে দাঁত মাজতে মাজতে মেজ আপা হিহি করে হাসতে হাসতে সেজ আপাকে বলল, ছোট দারোগার বৌ এত গয়না পরেছে কেন রে?

সেজ আপা গলা নিচু করে বলে, তবু আনু শুনতে পায়।

ঠিক বেশ্যাদের মতো দেখতে। ম্যাগো!

বড় আপা ঘুরে তাকাতেই চুপ হয়ে যায় ওরা। বড় আপা এবার আনুকে দেখেন। আনু জানে, ওটা খারাপ কথা শুনতে নেই। সে যেন আদৌ শোনেনি এ রকম মুখ করে একটা ডাল দিয়ে কষে দাঁতন করে চলে। কানে তার আবার ভেসে আসে মেজ আপার হি-হি। কি যে, খালি হাসতে পারে মেয়েটা! যখন ছোট দারোগার বৌ আসেন তাদের নাশতার জন্যে ডাকতে, সবাই পেটে হাসি চেপে মুখ কাঠ করে রাখে।

তা গয়না গায়ে একটু তার বেশিই। বোধ হয় ওদের অনেক টাকা, মনে মনে ভাবল আনু। তার বাবার মতো যে সবাই নয়, এটা অনেক দিন আগেই সে বুঝেছে। কিন্তু তার জন্যে একটুও রাগ হয় না বাবার ওপর, বরং কেমন মায়া করে। মনে হয়, সে যখন অনেক বড় হবে, অনেক টাকা রোজগার করবে, তখন বাবাকে এনে দেবে। বাবা সবাইকে গয়না বানিয়ে দেবেন, গাড়ি কিনবে আনু, আর নতুন জুতো। ট্রেনে করে কত দূরে দূরে যাবে আনু। জংশনে গিয়ে ছবি দেখে আসবে। একবার পানু ভাইয়ের সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছিল সে। তার মতো একটা ছোট ছেলে ছিল ছবিতে। কী চমৎকার ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে কাঁহা কাঁহা যাচ্ছিল।

নাশতা শেষে বাবা এসে নিয়ে গেলেন ওদের কোয়ার্টারে। গেটের সামনে গরুর গাড়ি উপুড় হয়ে আছে ল্যাজ তুলে। গরু দুটো ঘাস খাচ্ছে। আর সেপাইরা ট্রাঙ্ক বিছানা বাক্স টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে।

বাড়ির গন্ধটা ভারী পছন্দ হয় আনুর। ভেতরে ঢুকতেই মনটা ভুরভুর করে ওঠে তার। একটা নিম গাছ বড় হয়ে উঠেছে রান্না ঘরের পেছনে, আর বাড়িতে ঢুকবার মুখেই লেবুগাছ। গন্ধটা বুঝি লেবু পাতার। আনু নাক তুলে ঠাহর করবার চেষ্টা করে। বাবা বলেন, আনু শীগগির যা ভেতরে। তোর জায়গা পছন্দ করে নে। নইলে ওরা সব ভালো জায়গা নিয়ে নেবে দেখিস। আরে তাই তো! বাবা হাসতে হাসতে ওকে নিয়ে আসেন ভেতরে। হাঁক পেড়ে বলেন, কিরে ডালুসালু তোরা আনুকে কোথায় জায়গা দিলি? ও যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তখন কি একটা কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আপারা এঘর ওঘর ছুটোছুটি করতে থাকে। সালু আপা একটা জানালার শিক ধরে চেঁচিয়ে ওঠে নাচতে নাচতে।

আমি এইখানে থাকব। এখানে থাকব।

বাসাটা ছোট। একটা বড় ঘর, রান্নাঘর আর বাইরে ছোট্ট একটা ঘর—এই। উঠোনটা খুব বড়। রান্নাঘরের সামনে আগে যারা ছিল তারা গাঁদা ফুল লাগিয়েছিল। কদিনের অযত্নে মলিন হয়ে গেছে। টুকরো কাগজ, ন্যাকড়া, দেশলাইয়ের কাঠিতে গাছের তলা নোংরা হয়ে আছে। জালি বেড়ায় ভাংগন ধরেছে এর মধ্যেই। লেবুগাছটায় লেবু নেই একটাও। পাড়ার বখাটে ছেলেরা হয়ত পেড়ে নিয়ে গেছে। মিষ্টি একটা ঘ্রাণ শুধু পাতা থেকে পাওয়া যাচ্ছে ভেতরে। ঢুকেই আনু যা প্রথমে টের পেয়েছিল।

গাছপালার ঘ্রাণ ওর ভারী ভালো লাগে। এর আগে যেখানে ছিল, জায়গাটা এত শুকনো আর বালু বালু যেখানে কোন গাছ হতে চায় না। আর যে দুএকটা গাছ ছিল তাও এত

নিরস আর ধুলো মলিন যে মনটা খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন কেবল রোদ আর রোদের হলকা। সে হলকায় দশ হাত দূরের জিনিস সুম সুম করে কাঁপতে থাকে, যেন আয়নার মধ্যে একটা ছবি অবিরাম কাঁপছে। সে জায়গায় শুধু তরমুজ, ফুটি আর খরমুজ কাকুড় হতো। গাঁয়ের মানুষেরা একেক দিন এনে দিয়ে যেত এই এত এত। কচকচ করে চিবোতো সে লম্বা কাকুড়গুলো। তরমুজগুলো কুয়োর মধ্যে ফেলে রাখত ঠাণ্ডা হবে বলে। ঠাণ্ডা হলে দুপুর বেলায় বালতি দিয়ে তুলে এনে কাটা হতো।

বড় ঘরটার একদিকে বেড়ার পার্টিশন। ওপাশে ছোট্ট জায়গাটায় চৌকি পড়ল বাবার জন্যে আর আনুর জন্যে। আর এ পাশে থাকবে মা আর আপারা।

আনু তার ছোট্ট সুটকেশটা খুলে ফেলেছে। বইগুলো বার করে খবর কাগজ বিছিয়ে সাজিয়ে ফেলল টেবিলে। একটা বড় পোস্টার ছিল—তাতে অধিক খাদ্য ফলান লেখা, আর একদিকে ধান ভর্তি মাঠ, মাঠের পাশে গোলাঘর আর এক চাষী তার বৌ আর ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা—সারা ছবি চকচকে হলুদ রং-এ ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সেই পোস্টারটা খুলে বেড়ার পার্টিশনের গায়ে লাগালো আনু। শুলে পর ঠিক তার চোখের সামনে থাকবে। এই ছবিটা এত ভালো লাগে তার! চাষীর বৌ আর ছেলেমেয়েদের সাদা হাসিগুলো দেখতে দেখতে তার মনটাও খুশি হয়ে ওঠে, যখনই সে তাকায়। লাগিয়ে, চৌকির ওপর বসে, ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো আনু।
বড় আপা কী বলতে এসেছিলেন, হঠাৎ থেমে, খুশি হয়ে উঠলেন।

বাহ্, তুই সব সাজিয়ে ফেলেছিস আনু!

২. সকাল বেলা উঠেই আজ গোসল

সকাল বেলা উঠেই আজ গোসল করে নিয়েছে আনু। আজ তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন বাবা! বাবা ভোরে উঠেই থানায় গেছেন, মফস্বল থেকে নাকি খুনের আসামি ধরে এনেছে সেপাইরা, সেই কাজে। বলে গেছেন, দশটার সময় এসে আনুকে নিয়ে যাবেন, সে যেন তৈরি থাকে।

আনুর খুব খুশি লাগছে। এখানে এসে অবধি একটা বন্ধুও তার হয়নি। ছোট দারোগার কোনো ছেলেপুলে নেই; আর জমাদার সাহেব তার বৌ ছেলেমেয়েকে আগেই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বড় একা দিন কাটছিল আনুর—-পড়ার জন্যে যতটা নয়, তারচেয়ে বেশি বন্ধু পাবার লোভে স্কুলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

ভোরে গোসল করে উঠেই মাকে বারবার তাগাদা দিচ্ছে ভাতের জন্যে।

মা, শীগগীর ভাত দাও। দশটা বেজে গেছে।

কোথায় তোর দশটা?

মা বিরক্ত হয়ে ডালের পাতিলে ঘুটনি ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন।

হ্যাঁ, তুমি জানো? কত দেরি হয়ে গেল!

আনু অভিমান করে রান্নাঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় আপা তরকারি কুটছিলেন। তিনি মুখ তুলে বলেন, এখন তো মোটে সাড়ে আটটা রে! ইস্কুলে যাবার এত সখ!

বলে হাসেন আর ঘ্যাসঘ্যাস করে তরকারি কোটেন। আনু যে কেন অস্থির হয়েছে স্কুলে। যাবার জন্যে, সেইটে কাউকে বলা যাবে না। সেইটে লুকোবার জন্যে খুব মেজাজ করে আনু। বলে, তোমার মতো নাকি। খালি বাড়িতে বসে থাকব? লেখাপড়া করতে হবে না? এবার হেসে ফেলেন মা। মেয়েকে বলেন, আনুর আজকাল খুব মন হয়েছে লেখাপড়ায়।

হবে না? বড় আপা আবার হাসেন। জানো মা, আনু আমাকে বলেছে ও নাকি রেলের গার্ড হবে। তাই বোধ হয় এত ধুম পড়ার।

বলেছে তোমাকে। না মা মিথ্যে কথা! আমি বলিনি।

বলেই দৌড়ে পালিয়ে যায় আনু। রাগ হয় তার বড় আপার ওপর। কী যে, সব কথা মাকে। বলতে হয় নাকি? এই জন্যে সে রাতে চুপচুপ করে তাকে বলেছে? আর স্কুলে যাবার জন্যে যদি তাড়া করেই থাকে, তাতে এত হাসবার কী আছে?

এইজন্যে একেক সময় দেখতে ইচ্ছে করে না বড় আপাকে। বেশ, আমি গার্ড হবো তাতে ওর কি? গার্ডের চাকরি সবাইক দেয় বুঝি রেলের লোক? গার্ড হতে হলে কত বুদ্ধি, আর লেখাপড়া লাগে তার কী জানে বড় আপা?

সত্যি, মন্দ হয় না গার্ড হলে। কত দেশ যারা যেতআর কী সুন্দর চাকরি। বাবার মতো থানায় গিয়ে চোর-ডাকাতকে হাতকড়া লাগানো নয়, সাইকেল নিয়ে মফস্বলে যাওয়া নয়, ও-রকম বিশ্রী ঘরে কাগজপত্রে উপুড় হয়ে পড়ে লেখা নয়! গার্ডের চাকরি কত মজার! হাতে লাল আর সবুজ নিশান, মুখে বাঁশি, সাদা ধবধবে প্যান্ট, কোট, পেতলের বোতাম লাগানো, পকেটে ঢাকনা, মাথায় চকচকে বারান্দাওয়ালা টুপি। ফুরুর করে বাঁশিতে ফুঁ না। দিলে ড্রাইভারের কোন ক্ষমতাই নেই গাড়ি চালায় তার কাছে ইঞ্জিন থাকলে কী হবে? সারাদিন তাকে ইস্টিশানে ঠায় বসিয়ে রাখতে পারে গার্ড। আবার চলতে চলতে যদি লাল নিশান দেখায় তো থামাতে হবে গাড়ি। গার্ডের চাকরি কী সোজা! বড় আপা খালি হাসতেই পারে। গার্ড হয়ে তাক লাগিয়ে দেবে যেদিন আনু, সেদিন বুঝতে পারবে। বড় আপা, মেজ। আপা, সালু আপা, মিনু আপা, ছোটআপা, মা, বাবা, পানু ভাই সবার সামনে আনু গম্ভীর হয়ে বাঁশি বাজিয়ে নিশান দেখিয়ে চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠবে। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। আনু তাদের দেখবেই না। আনুর কত কাজ। আনু তখন শেষবারের মতো নিশানটা দুলিয়ে ভেতরে গিয়ে খাতা খুলে বসবে। আনু দেখেছে গার্ডেরা খাতা খুলে লেখে গাড়ির মধ্যে। হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায় আনুর। তার বড় হতে এখনো কত দেরি। গার্ড হতে তার দশ বিশ বছর লেগে যাবে। ততদিন তো আর কিছু করার উপায় নেই। ততদিন চুপ করেই থাকতে হবে আর সহ্য করতে হবে ওদের ঠাট্টা, হাসি।

পানু ভাই যদি গার্ড হতো, তাহলেও বেশ হতো। তাহলে আনু পানু ভাইর সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতে পারতো। গার্ড না হোক, অন্তত গার্ডের ভাই বলে বাহাদুরি নিতে পারতো। আনু শুনেছে পানু ভাই নাকি আর লেখাপড়া করবে না, চাকুরি খুঁজছে। এবার আনু ঢাকায় পানু ভাইকে চিঠি লিখে দেবে—-ভাইয়া, তুমি গার্ডের চাকরি নিও।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনু রাস্তায় দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ দেখে। দেখে, গরুর গাড়ি কাঁচোর কাঁচোর করতে করতে বাজারের দিকে চলেছে। আবার উল্টো দিকে ট্রেন ধরবার জন্যে উলিপুরের বাসটা বুর বুর করে ছুটে চলেছে স্টেশনের দিকে। তাহলে তো এখন নটা বাজে! নটার সময় রোজ উলিপুরের বাসটা তাদের বাসার সামনে দিয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি বাসার ভেতরে আসে আনু। কিন্তু আর রান্নাঘরে গিয়ে মাকে তাগাদা করতে সাহস হয় না। কেমন লজ্জাও করে। অথচ তার ইচ্ছা করছে এখুনি সে ছুটে ইস্কুলে গিয়ে বসে।

নিজের ছোট্ট সুটকেশটা খুলে ধোয়া প্যান্ট আর নতুন জামাটা বার করে আনু। জামাটা গেল হপ্তায় কিনে দিয়েছিলেন বাবা। নীল সরু ডোরা কাটা, টেনিস কফ শার্ট। কলারে এখনো কাগজের লেবেল সুতো দিয়ে আটকানো। লেবেলটা ছিঁড়ে ফেলে আনু গায়ে দিল শার্টটা। কাপড়ের নতুন গন্ধ ভুরভুর করে বেরুচ্ছে। ভারী মিষ্টি লাগছে। আর ইস্ত্রী করায় এত মসৃণ। লাগছে যে হাতের তেলো পিছলে যায়। প্যান্টটা খুলে দেখে একটা বোম

ভাঙা। পাশের ঘরে সালু আপা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। রুমালের ফুল আঁকছিল। তাকে গিয়ে ধরলো আনু।

দেনা আপা বোতামটা লাগিয়ে।

যা, পারবো না।

সালু আপা তার দিকে না তাকিয়েই ধমক দিয়ে ওঠে। আনু আবার অনুনয় করে, একটা মোটে। দিবি না?

যা, ভাগ, গোলমাল করিস না।

বারে, আজ আমি ইস্কুলে যাবো, তুই জানিস না?

তবু সালু আপা শোনে না। গুন গুন করে আপন মনে সে পেন্সিল দিয়ে রুমালে ফুলের নকশা আঁকতে থাকে। আনু হঠাৎ তার হাত থেকে কাপড়টা টেনে ছুঁড়ে দেয় উঠোনে। বলে, দিবি না তো, দিবি না।

তার ডুকরে ওঠা কান্না শুনে বড় আপা ছুটে আসেন।

কিরে, কি হয়েছে?

সালু আপা আরো জোরে কেঁদে উঠলো তখন। যা মুখে এলো তাই মিথ্যে করে বলল, আনু আমার রুমাল ছিঁড়ে ফেলেছে, আমাকে মেরেছে।

আনু অবাক হয়ে গেল মিথ্যেটা শুনে। প্রতিবাদ করবার মতো বুদ্ধিও তার মাথায় জোগাল না। সে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো বোতাম-ভাঙা প্যান্টটা হাতে নিয়ে। বড় আপা একবার তাকে দেখলেন, একবার সালুকে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ছিঃ সালু, আনু আজ ইস্কুলে যাবে। এখন কাঁদাকাটি করতে নেই।

আনু তখন সাহস পেয়ে বলল, আমার বোতামটা লাগিয়ে দিতে বলেছি

দে আমাকে, আমি দিচ্ছি।

বড় আপা আলমারি থেকে কৌটো বার করে তক্ষুণি সূঁচে সুতো পরাতে লাগলেন। লাগিয়ে দিলেন নতুন একটা বোতাম। বোতাম লাগানো শেষ হলে দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে বললেন, যা আনু, ভাত খেয়ে নে। ভাত হয়ে গেছে।

মা আজ ফেনা-ফেনা ভাত রেঁধেছেন। আনুর জন্যে বার করেছেন ফুল তোলা কাঁচের প্লেট। আনুর আজ খাতির আলাদা। আজ সে স্কুলে যাবে ভর্তি হতে। প্লেটে ভাত বেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাতের মিষ্টি গন্ধে আর ধোঁয়ায় ভরে গেল আনুর মুখ। বড় আপা চামচে করে ঘি এনে ছড়িয়ে দিলেন ভাতের ওপর। মা শিল-আলুর ভর্তা করেছেন, এক

দলা পাতে দিলেন তার। গরমে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। মা এক হাতে আঁচল দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। আনু ফুঁ দিয়ে দিয়ে মাখাতে লাগল। ভাতের সঙ্গে আলু। এক গ্রাস মুখে তুলল। মধুর মতো লাগল।

বড় আপা বললেন, আস্তে খা আনু, এখনো দেরি আছে। পেট ভরে খাবি।

দূর।

আনু আস্তে বলে। খেতে বসে দেখে তার বিশেষ খিদে নেই। আর গলার কাছে কেমন সব আটকে যাচ্ছে।

পেট ভরে না খেলে দেখবি হেড মাস্টারের সামনে গিয়ে সব হজম হয়ে গেছে ভয়ে।

যাঃ। আমার ভয় করে না।

পড়া ধরবে যে। পারবি?

ধরুক না। যা ইচ্ছা ধরুক, আমি সব উত্তর দিয়ে দেব।

মা খুশি হয়ে একবার আনুর দিকে একবার মেয়ের দিকে তাকান। বলেন, না। আনু পড়ায় কত ভালো।

বড় আপা পাবদা মাছের ঝোল বেড়ে দিলেন কাঁসার বাটিতে। নিজের হাতে তুলে দিলেন আনুর পাতে। কুচি কুচি করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে রাধা! সোনার মতো হলুদ রং হয়েছে। ঝাল ঝাল গন্ধ বেরুচ্ছে। জিভে পানি এসে যাচ্ছে। আনু ঢকঢক করে এক গ্লাশ পানি খেল।

এমন সময় বাইরে বাবার গলা শোনা গেল।

আনু, ও আনু।

বড় আপা তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে বললেন, খেতে বসেছে বাবা।

তাড়াতাড়ি করতে বল। ওকে ইস্কুলে দিয়ে আমি আবার মফস্বলে যাবো।

বাবার গলা শুনে আনুর যেন আর এক মুঠো ভাতও গলা দিয়ে নামতে চায় না। বুকটা ধুকধুক করে ওঠে। কি এক অজানা আশঙ্কায় অস্থির লাগে। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। মা প্রায় চিৎকার করে ওঠেন–কি, তোর খাওয়া হয়ে গেল?

আর খাবো না।

বলতে বলতে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে অনু। উঠোনে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, সাইকেলটা বের করে নিয়েছেন।

আনু এক দৌড়ে ঘরের ভেতর গিয়ে মুখ মোছে, খাতা আর ইংরেজি বাংলা বই নেয়, চট করে একবার আয়নায় মুখ দেখে, তারপর বেরিয়ে আসে। বাবা বলেন, বাহ, জামাটা আনুর গায়ে খুব মানিয়েছে তো? ভাত খেয়েছিস?

হ্যাঁ

মাকে সালাম করলি না?

আনুর লজ্জা লাগে তখন। ধুৎ সে পারবে না। স্কুলে ভর্তি হতে গেলেই বুঝি মাকে সালাম করতে হবে! মহাসংকটে পড়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আওয়াজ শুনে মিনু আপাও এসে দাঁড়িয়েছেন বারান্দায়, সে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

লজ্জা থেকে মা আনুকে বাঁচিয়ে দেন। ঘোমটা টেনে কাছে এসে আনুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, ভালো করে লেখাপড়া করিস। কারো সঙ্গে মারামারি করবি না, কেমন?

আনু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বাবার পেছনে বেরিয়ে আসে। সাইকেলের সামনে উঠে বসে এক লাফে। বাবা সাইকেল চালাতে থাকেন। আনু একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে দরোজা ধরে মা বড় আপা মিনু আপা দাঁড়িয়ে আছেন।

দুটো টানা লম্বা ঘর—- ব্যাস, এই হচ্ছে ইস্কুল। সামনে সবুজ ঘাসে ভরা বিরাট মাঠ, তার দুদিকে দুটো গোল পোস্ট রোদে বৃষ্টিতে ভিজে পুড়ে কেমন কালো আর এবড়ো-থেবড়ো হয়ে গেছে? স্কুল ঘরের মাথার ওপর জামরুল আমলকি আর লিচু গাছের বড় বড় ডালগুলো নেমে এসেছে রাশি রাশি পাতা-পত্তর নিয়ে। ছাদ একেবারে ছেয়ে গেছে, টিনগুলোয় সবুজ স্যাঁতলা পরে গেছে। আনু হা করে তাকিয়ে দেখে—এই স্কুল! ক্লাশ বসে গেছে, বড় বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছেলেদের সার সার মাথা। কেউ নিচু হয়ে বই দেখছে, লিখছে, কেউ সামনে তাকিয়ে আছে, আবার কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে লুকিয়ে। সবাই ক্লাশে, তাই খাঁখাঁ করছে যেন ইস্কুলের মাঠ, রাস্তা, বারান্দা। মাঠের মাঝখানে বাবা নেমে পড়লেন সাইকেল থেকে। আনুও নামলো। বাবা বললেন, অঙ্ক সব ভালো করে মনে করে এসেছিস তো?

আনুর বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করে ওঠে। ঘাড় কাৎ করে জানায়-হ্যাঁ। বাবা সাইকেলটা বারান্দায় ঠেস দিয়ে রাখেন।

বাবা আগে ঢোকেন হেড মাস্টারের কামরায়। আনু মাথা নিচু করে তার পেছনে পেছনে আসে। দরোজার ভেতরে পা দিয়েই এক হাত তুলে সালাম করে সে ভীত-চোখ তুলে, তারপর কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

মাথায় টাক, গাল থোবড়ানো, জ্বলজ্বলে এক জোড়া চোখ আর গায়ে গেরুয়া রংয়ের চাপকান এ ছাড়া হেড মাস্টারের আর কিছুই চোখে পড়েনি আনুর। দেখেই কেমন ভয় করে। মনে হয়, এখুনি বুঝি ধমক লাগাবেন। কেমন গম্ভীর আর রেগে টং হয়ে আছেন যেন।

বাবা হেড মাস্টারকে কি বলতে লাগলেন তার একবর্ণ কানে গেল না আনুর। তার কান গরম হয়ে উঠেছে, ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে, পা কাঁপছে, প্রস্রাব পাচ্ছে খুব। এখন সদি এক দৌড়ে সে বাসায় চলে যেতে পারত আপাদের কাছে তাহলে যা মজা হতো।

আনু ভয়ে ভয়ে আবার চোখ তোলে। দেয়ালে পৃথিবীর ম্যাপ ঝোলানো। আলমারিতে খাতাপত্র বই সার সার সাজানো। ময়লা কাঁচের ভেতর দিয়েও দেখা যাচ্ছে। আবার দুটো কাঁচ ভাঙা সেখানে পিচবোর্ড কেটে লাগিয়ে দেওয়া। এদিকে একটা লম্বা টেবিলের চারদিকে কয়েকটা হাতাওলা চেয়ার। টেবিলের ওপর চক ন্যাকড়া আর একগোছা বেত রাখা। আমলকির ডাল ভেঙে একটা বেত করা হয়েছে। লিকলিক করছে। ইস্, এইটে দিয়ে মারে নাকি! যা লাগবে!

হেড মাস্টারের ভারী গলার আওয়াজ শুনে চমকেই উঠেছিল আনু।

কাম হিয়ার, মাই বয়।

এক পা এক পা করে কাছে এসে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল আনু। এক পলক তাকিয়ে দেখল বাবা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে! আনু ঘামতে লাগল, ইংরেজিতে পড়া ধরবে নাকি? হেড মাস্টার আস্তে আস্তে থেমে থেমে জিগ্যেস করলেন, হোয়াট ইজ ইওর নেম?

মাই নেম ইজ আনোয়ার হোসেন।

হোয়াট ইজ ইওর ফাদারস্ নেম?

মাই ফাদারস নেম ইজ মৌলবি গোলাম হোসেন।

ভেরি গুড।

আনুর ভেতরটা যেন হঠাৎ হালকা হয়ে গেল। না, সে একটিও ভুল করেনি। বাবা বললেন, ওকে আমি নিজে পড়াই দুবেলা। হঠাৎ ট্রান্সফার হয়ে আসতে হলো। এখন ভর্তি না হলে স্কুলে যাবার অভ্যেসটাই ছুটে যাবে। ওখানে ফোরে পড়ত। এখানে ফোরেই অ্যাডমিশন নিক–বইপত্র হয়ত মিলবে না, কিন্তু একটা বছর নষ্ট হয়ে যায় তাহলে।

হেড মাস্টার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, একমণ চালের দাম ৩৫ টাকা হলে আট সেরের দাম কত?

আনু বিড়বিড় করে হিসেব করতে লাগল মনে মনে। কি যেন আর্যাটা ছিল, কিছুতেই এখন মনে পড়তে চাইছে না তার। ঠকঠক করে পা কাঁপতে লাগল, পিপাসা পেল, তবু মনে হলো না। মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে রইলো। বাবার দিকে একবার তাকালো। বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। পারল না সে।

হেডমাস্টার আবার জিজ্ঞেস করলেন, একমণ চালের দাম ৩৫ টাকা হলে আট সেরের দাম কত হয়?

পা দিয়ে মেঝে খুঁটতে লাগল আনু।

বাবা হেসে বললেন, অঙ্কে ও বরাবরই একটু কাঁচা। কিরে আনু? ৩৫ টাকা মণ। এক সেরের দাম কত?

তাকে আট দিয়ে গুণ দিলেই বেরিয়ে আসবে।

এক সেরের দাম?

হ্যাঁ।

আচ্ছা থাক।

হেডমাস্টার বাঁচিয়ে দিলেন তাকে। বললেন, এই কবিতাটা পড় দেখি।

আনুকে একটা বই খুলে দিলেন। আনু অঙ্কের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে, অঙ্ক না পারার লজ্জা ঢাকবার জন্যে, খুব মন দিয়ে পড়তে লাগল জোরে জোরে

ধন–ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
ও সে স্বপ্ন দিয়ে গড়া সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র–সূর্য–গ্রহ–তারা
কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে।
ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে।
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ-ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

থাক, থাক।

হেডমাস্টার হাত তুললেন। আনু তাকিয়ে দেখে বাবা খুব খুশি হয়েছেন। আনু অবাক হয়ে দেখে বাবার চোখে পানি এসে গিয়েছে। চকচক করছে। বড় দেখাচ্ছে তাঁর চোখের কালো তারা। আনু তখন বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বইটা মুড়ে বুকের কাছে ধরে।

হেডমাস্টার জিগ্যেস করলেন, হরিৎ-ক্ষেত্র মানে কি?

হরিৎ-ক্ষেত্র?

আনু আবার অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। হরিৎ-ক্ষেত্র মানে তাহলে কি? হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় পরের লাইনে ধানের কথা আছে। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, হরিৎ-ক্ষেত্র মানে ধানের ক্ষেত।

বাবার মুখের হাসিটা নিভে যায়। আনু বুঝতে পারে সে নিশ্চয়ই ভুল করেছে। পরক্ষণে বলে, আমি জানি না।

তুমি খানিকটা ঠিক বলেছ। হেডমাস্টার আশ্বাস দেন তাকে। হরিৎ মানে সবুজ শ্যাম। ধানের ক্ষেতও সবুজ। তবে হরিৎ-ক্ষেত্র মানে সবুজ মাঠ। যখনই নতুন শব্দ পাবে, দেখবে তার মানে জানো না, বাবাকে বা স্কুলে মাস্টার সাহেবকে জিগ্যেস কর। জিগ্যেস করে মানেটা বারবার মুখস্ত করে রাখবে। বুঝলে?

জি।

আর বানানটা খাতায় দশবার লিখে শিখে রাখবে।

আনু ঘাড় কাৎ করে সায় দেয়। হেডমাস্টার বইটা ফেরৎ নেন। বাবাকে বলেন, আচ্ছা। আপনার ছেলে এখন ফোরেই ক্লাশ করতে থাকুক। পরে দেখা যাবে কী হয়। এমনিতে বেশ স্মার্ট বলে মনে হচ্ছে।

আনু বুঝতে পারে তার প্রশংসা হচ্ছে। তার লজ্জা হয় অঙ্কটা তার পারা উচিত ছিল। এখন হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আর্যাটা। মনে পড়ে যায় পঁয়ত্রিশ টাকা মণ হলে এক সেরের দাম হয় চৌদ্দ আনা—আট সেরের দাম সাত টাকা। কিন্তু বলতে পারে না। ঘনঘন চারদিকে তাকায়। বলবে? না, থাক। ইস, তখন মনেই পড়ছিল না। বাবা খামকাই বলেন, অঙ্কে কাঁচা। বাসায় গিয়ে বলবে বাবাকে, আট সেরের দাম সাত টাকা।

হঠাৎ হেডমাস্টার চিৎকার করে ডাক দেন, বিলটু, বিলটু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুলের দারোয়ান এসে দাঁড়ায়!

একে ক্লাশ ফোরে নিয়ে বসিয়ে দাওগে।

বাবা পেছন থেকে বলেন, ছুটির পরে একা আসতে পারবি বাসায়? না ইয়াসিনকে পাঠিয়ে দেব?

আনু বলে, নাহ্।

বিল্টুর পেছনে ক্লাশের দিকে যেতে থাকে আনু।

৩. টিফিন পিরিয়ডে একটা ছেলে

টিফিন পিরিয়ডে একটা ছেলে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে চীনেবাদাম খাচ্ছিল। বাদাম দেখে জিভেয় পানি এসে যায় আনুর। সকালে স্কুলে আসবে বলে দুআনা পয়সা আদায় করেছিল।

ভাবলো, দুপয়সার বাদাম কিনলে মন্দ হয় না।

উঠতে যাবে, তার আগেই ছেলেটা তাকে বলে, বাদাম খাবে?

বলেই একমুঠো বাদাম তুলে দেয় তাকে। আনুর লজ্জা করতে থাকে। সে তো নিজেই কিনতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার কোনো কথাই শোনে না ছেলেটা। তাকে বাদাম দিয়ে বলে, খাও না। আমার মেলা অছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ভাব হয়ে যায় তার সঙ্গে। বেশ নাম—-পিন্টু। তার সঙ্গেই পড়ে। আনু জিগ্যেস করে, তোমার বাবা কি করে?

জুট মার্চেন্ট।

মানে?

বাবার বিরাট পাটগুদাম আছে। কত দূর দূর দেশে বাবা পাট পাঠায়। অস্ট্রেলিয়া, বিলাত, কলকাতা, ঢাকা। তিনটে চারটে মালগাড়ি ভর্তি।

আনুর খুব মজা লাগে। দূর দেশের কথা শুনে সারা গায়ে রোমাঞ্চ কাঁচা হয়ে ফুটে ওঠে। ঘন হয়ে বসে আনু। পিন্টুর হাতে হাত রেখে শুয়ে, তোমার বাবা যায় বিলাতে?

নাহ্।

তখন মনটা নিভে যায় আনুর।

কেন?

বাবা যাবে কেন? রেলগাড়িতে পাট নিয়ে যায়, সেখান থেকে জাহাজে করে চলে যায়। বাবার এখানে কত কাজ।

তবু খুশি হয় না আনু। পিন্টুর বাবা পাট পাঠায় আর নিজে যেতে পারে না? আনু যদি ও রকম হতো তাহলে নিজেই যেত জাহাজে চড়ে। চুপ করে বসে থাকে সে। বসে বসে ভাবতে থাকে। ছবির বইতে দেখেছিল সমুদ্রের জাহাজ, সেই জাহাজ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

হঠাৎ বলে, আবার জলদস্যুরা জাহাজ আক্রমণ করে, না পিন্টু?

পিন্টু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, দূর, ওসব খালি গল্পের বইয়ে লেখে। সায়েবরা কামান দিয়ে কবে সব জলদস্যুদের মেরে ফেলেছে।

সব মেরে ফেলেছে?

আনুর যে বিশ্বাসই হতে চায় না।

হ্যাঁ, সব। পিন্টু সবজান্তার মতো উত্তর দেয়। বাদামের খোসাগুলো কোল থেকে ঝেড়ে ফেলে। তারপর আচমকা বলে, তোমার চেহারাটা ঠিক মেয়েদের মতো।

যাহ।

কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায় আনুর। কি যে বলে পিন্টু! তার চেহারা মেয়েদের মতো কে বলেছে? আয়নায় সে বুঝি দেখে নি? পিন্টু ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, তুমি আর আমি বন্ধু, কেমন?

আচ্ছা।

আর কারু বন্ধু হতে পারবে না কিন্তু।

আনু কিছু বলে না। তার কাঁধে ধাক্কা দেয় পিন্টু, কি?

আচ্ছা।

তোমার ক ভাই বোন?

আমরা দুভাই পাঁচ বোন। ভাই বোন সব আমার বড়।

পাঁচ বোন!

পিন্টু তার কথার প্রতিধ্বনি করে। বলে, বিয়ে হয় নি?

না।

তাহলে খুব মজা তোমার বোনের, না?

বলে ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে থাকে পিন্টু। হঠাৎ গা জ্বালা করে আনুর। পিন্টু আবার বলে, ভালোবাসে না তোমার বোনেরা? চিঠি লেখে না?

আনুর ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পিন্টু।

দূর লজ্জা কি? আমার বোনের চিঠি কত নিয়ে যাই। মাসুদ ভাই আছে, বাবার গদিতে কাজ করে, আমাকে আট আনা করে পয়সা দেয়।

দিক্ গে।

বারে, মেয়েরা তো ঐ জন্যেই সাজে, গালে পাউডার মাখে, ফিতে বাঁধে। দূর বোকা!

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আনু। তারপর কেউ কিছু ঠাহর করবার আগেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় পিন্টুকে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, শয়তান। অসভ্য।

মাটিতে পড়েই পিন্টু বোকা হয়ে যায়। একমুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আনুর দিকে। তারপর উঠে গা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, যা, আজ কিছু বললাম না। এর শোধ নেবো দেখিস। তোর বোনেরা কত সাধু আমি খুব জানি।

অবাক হয়ে যায় আনু। এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা তার। কখনো কখনো দারোগার ছেলে বলে তাকে ছেলেরা খ্যাপাতো, তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিত অনেকে, কিন্তু বোনের কথা তুলে এরকম বিচ্ছিরি কথা কেউ বলেনি। মহিমপুরে এসে অবধি স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল সে, ভেবেছিল নতুন বন্ধু করবে, মনটা আনন্দে ভরে ছিল। এই নাকি এখানকার ছেলেরা!

আনুর কান্না পায় ভীষণ। সে ক্লাশে গিয়ে পেছনের বেঞ্চে চুপ করে বসে থাকে। সারাটা ক্লাশ খালি। টিফিনে গেছে সবাই। বুকের মধ্যে হু-হুঁ করতে থাকে তার। আবার ভয় করতে থাকে, পিন্টু যদি তাকে হঠাৎ মার দেয়, লাল খাতায় যদি নাম উঠে যায় আনুর।

.

ঢং ঢং করে টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে। হুড়মুড় করে ছেলেরা ঢুকতে থাকে ক্লাশে। আনু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসে। চোখ রাখে একেবারে সোজা ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে! কোনোদিকে তাকাবে না সে। আবছা দেখতে পায়, পিন্টু এসে সেকেণ্ড বেঞ্চে বসলো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে আরো দুজন ছেলে ঘুরে দেখলো আনুকে। আনু বইয়ের পাতায় চোখ। নামালো তাড়াতাড়ি। ওরা কি বলাবলি করছে কে জানে। ভূগোলের স্যার এসে ঢুকলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল।

ভূগোল পড়তে এত ভালো লাগে আনুর! সালু আপার ভূগোল বই নিয়ে সে পড়ে ফেলেছে। সেখানে আফ্রিকার কথা, এশিয়ার কথা, অগ্নিগিরির নাম কত কি আছে। এখানে খালি রংপুর জেলার ভূগোল। একটুও মজা লাগে না আনুর। পাশের ছেলের বইটা ভাগ করে দেখতে থাকে আনু।

স্যার একটা ছেলেকে বলেন এই তুমি। রিডিং পড়ো। আজ কোথা থেকে পড়াবার কথা ছিল?

খসখস করে সার ক্লাশে পাতা উল্টানোর শব্দ ওঠে। আরেকটা ছেলে বলে, এখান থেকে। স্যার। মহিমপুরের পাশ দিয়া ধরলা নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

হ্যাঁ পড়ো।

ছেলেটা দাঁড়িয়েই ছিল। সে তখন আবৃত্তির ঢং–এ গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পড়তে থাকে।

মহিমপুরের পাশ দিয়া ধরলা নদী প্রবাহিত হইতেছে। এঁ-এঁ-এঁ ধরলা নদী তিস্তা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এঁ-এঁ-এঁ-

আনু পাশের ছেলেটার বইয়ে চোখ রেখে মনে মনে পড়ে যায়। পড়তে পড়তে এগিয়ে যায় অনেকদূর। হঠাৎ তার চোখে পড়ে এক জায়গায় লেখা রয়েছে, শীতকালে যখন বাতাস স্বচ্ছ থাকে তখন প্রত্যুষে ধরলা নদীর পাড় হতে উত্তরে হিমালয় পর্বত ও পূর্বে গারো পাহাড় দেখা যায়। হিমালয় পর্বতের বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা মহিপুর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। বইয়ের পাতায় নিবিড় হতে থাকে আনুর মন। কাঞ্চনজঙ্ঘা! এতদিন সে নামই শুনে এসেছে; এখান থেকে দেখা যায় নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা? মনে মনে হিসাব করে দেখে শীত আসতে এখনো দুমাস বাকি। দুমাস তাকে বুক বাধতে হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার জন্যে। বাবাকে গিয়ে আজই এই খবরটা দেবে আনু।

পড়া একবর্ণ আর তার মাথায় যায় না। পাহাড় সে কখনো দেখেনি। পাহাড়ের কল্পনা তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এক সময়ে ভূগোলের ক্লাশ শেষ হয়ে যায়। তারপরে আসে স্বাস্থ্যের স্যার। স্বাস্থ্য পড়তে একেবারে জলো লাগে না আনুর। তার হাই ওঠে। হাই তুলতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকায়। আর পাশের ছেলেটা তখন বলছিল, এখানে নাকি খুব শাস্তি দেয়। আনু নিজেও হেডমাস্টারের রুমে এক গোছ বেত দেখে এসেছে। সোজা হয়ে শিষ্ট চেহারা করে আনু বসে।

স্বাস্থ্যের স্যার দেখতে রোগা পাতলা, একেবারে একটা কাঠির মতো। মনে হয় বাতাসে হেলে পড়েছেন সামনে। দাঁতগুলো বড় বড় আর বিশ্রী ফাঁক মাঝে মাঝে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। নাম শুনলো, সুরেন বাবু।

স্যার ক্লাশে ঢুকেই ':' করে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করলেন। তারপর চেয়ারে বসে দুপা। টেবিলে তুলে এপকেট ওপকেট হাতড়াতে লাগলেন। বেরুলো একটা নস্যির কৌটা আর নাকের ময়লা ভর্তি লালচে ভিজে জবজবে এক ফালি ন্যাকড়া। ফস্ করে নাকে নস্যি দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে নাক টিপে ধরে প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন সুরেন স্যার।

কাণ্ড দেখে প্রায় হেসেই ফেলেছিল আনু। পাশের ছেলেটা বলল, স্যার কিন্তু খুব রাগী। শুনে তাড়াতাড়ি মুখ শুকিয়ে ফেলল আনু। সুরেন স্যার হুংকার দিয়ে ডাকলেন, এইও। ইদিক আয়।

পয়লা বেঞ্চের পয়লা ছেলেটা ঠোঁট কান পর্যন্ত ফাঁক করে দাঁত দেখাল। চশমার ভেতর দিয়ে পিটপিট করে দেখলেন তিনি। তারপর বেত দুলিয়ে আবার হুকুম করলেন, জিহ্বা। আনুর আবার হাসি পাচ্ছিল জিউভা উচ্চারণ শুনে, কিন্তু জোর সামলে নিয়েছে সে।

জিভ দেখে কোনো খুঁত পেলেন না স্যার। বললেন, যা। নেকস্ট। পরের ছেলেটা উঠে গেল।

আনু ফিসফিস করে জিগ্যেস করলো, সবার দাঁত জিভ দেখবে নাকি ভাই?

হ্যাঁ।

রোজ দেখে?

না। প্রত্যেক বিষুৎবারে।

ভাগ্যিস আনু আজ নতুন স্কুলে আসবে বলে নিমডাল দিয়ে কষে দাঁতন করেছিল! জিভেটায় না জানি কত ময়লা পড়ে আছে। জিভ কোনদিন সাফ করেনি আনু। পানু ভাইকে দেখতে সে পিতলের একটা দুলুনি দিয়ে একেক দিন সকালে ময়লা কেটে ফেলতে। আনুর পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। পয়লা দিনই মার খাবে নাকি স্যারের হাতে।

এতক্ষণে সেই পিন্টুর পালা এসেছে।

দাঁত।

দাঁত বার করলো পিন্টু। সপাং করে বেত পড়ল তার পাছায়।

হারামজাদা, কচুবনে কচু খাও গিয়ে? মায়ে ভাত দেয় না? দাঁত এত হলদে কেন? কেন?

একবার করে কেন বলেন আর একটা করে বেত লাগান সুরেন স্যার। সঙ্গে সঙ্গে তিড়তিড় করে ওঠে পিন্টু। আড়চোখে সে আনুকে দেখে। আনুর কেন যেন কষ্ট হয়। টিফিনে ঝগড়া। হয়েছে, তবু। চট করে চোখ নামিয়ে নেয় সে। পিন্টুর আর জিভ দেখা হয় না। শেষ একটা বেত লাগিয়ে সুরেন স্যার বলেন, গো ব্যাক। নেস্ট।

এক এক করে এক সময়ে আনুর ডাক পড়ে। সে মাথা নিচু করে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছু বলবার আগেই দাঁত বার করে। সুরেন স্যার বেত দুলিয়ে বলেন, মুখ না তুললে কি পিড়ি পেতে তোমার দাঁত দেখব?

চট করে মুখ তোলে আনু। চোখটা আপনা থেকেই বুজে আসে তার। গম্ভীর একটা আওয়াজ শুনতে পায়, হুঁ। জিভ। বেত লাগাবার সুযোগ না পেয়ে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে বুঝি স্যারের। জিভ দেখি।

দেখাল আনু।

হঠাৎ সুরেন স্যার চোখ পিটপিট করলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, এটা কে র‍্যা? ক্লাশের মনিটর দাঁড়িয়ে বলল, নতুন ভর্তি হয়েছে স্যার।

তোমাকে জিগ্যেস করিনি স্যার। সিট ডাউন।

ম্যাজিকের মতো বসে পড়ল মনিটর ছেলেটা। আনুর পিলেও চমকে গিয়েছিল স্যারের সিট ডাউন চিৎকার শুনে। দরদর করে ঘামতে লাগল সে।

নাম কী?

আনোয়ার হোসেন।

বাবা কী করে?

বড় দারোগা। দাঁ

ত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন সুরেন স্যার। দারোগার ছেলে, ঘোড়ার মত স্বাস্থ্য হবে এরকম লাউডগাটি হয়েছেন কেন? লেখাপড়ায় কেমন?

কী বলবে আনু। চোখ তুলে স্যারকে একবার দেখে আবার মাথা নিচু করে থাকে। সুরেন স্যার হঠাৎ জিগ্যেস করেন, আচ্ছা শুনি, বিশুদ্ধ জল কেমন?

বিশুদ্ধ জল? ঢোঁক গেলে আনু।

আজ্ঞে হাঁ। বলুন।

আনু ভারী অস্বস্তিবোধ করতে থাকে তাকে এই ঠাট্টা করে আপনি বলায়। কেন যেন রাগ হয় তার। উত্তরটা জানাই ছিল। চালাকি নাকি? চট করে সে জবাব দেয়, বিশুদ্ধ জলের কোনো বর্ণ নাই, স্বাদ নাই।

কিন্তু তাতেও খুশি হলেন না স্যার। এমনিতেই রোগ মানুষ, তার ওপর যখন দাঁত খিচোন মনে হয় দাঁত সর্বস্ব শরীর। আর সবচে শকিল ইলশেগুঁড়ির মতো থুতু ছিটোতে থাকে। থুতু ছিটিয়ে স্যার বলেন, আর গন্ধ! বিশুদ্ধ জলে পচা ভাগাড়ের গন্ধ থাকবে বুঝি?

আনু তাড়াতাড়ি যোগ করে, গন্ধও নাই।

বেতের ইশারায় তাকে ফিরে যেতে বললেন স্যার। আবার হাঁক পাড়লেন, নেকস্ট।

এমনি করে পিরিয়ড শেষ হলো। পাশের ছেলেটা বলল, এই স্যার কিছু পড়ায় না ভাই। খালি এই রকম করে।

সুরেন স্যার চলে যেতেই হি-হি করে হাসতে লাগল আনু। এতক্ষণের সব হাসি ফিনিক দিয়ে ছুটছে তার। উলটো বুঝলো পিন্টু। সে পেছনে ঘুরে তাকিয়ে ঘোষণা করল, তোর পাছায় যেদিন বেত লাগাবে স্যার আমিও দাঁত বার করে হাসবো। হ্যাঁ।

শেষ পিরিয়ড। ড্রয়িং স্যার এসে ঢুকলেন। ফর্সা চৌকো চেহারা। সরু করে ছাঁটা গোঁফ। ধবধবে সাদা শার্ট গায়ে। হাসি হাসি মুখ। আনুর খুব ভালো লাগল।

স্যার বসতে বললেন সবাইকে। তারপর বোর্ডে অনেকক্ষণ ধরে একটা বিরাট আমপাতা আঁকলেন—-মাঝখানে ভাঁজ করা, পাতাটা দেখতে হয়েছে ইংরেজি ভি-এর মতো। সুন্দর হলো দেখতে, যেন সত্যি আমপাতা। একবারও মুছলেন না, ভুল হলো না—-একটানে এঁকে ফেললেন। তার হাতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আনু।

আঁকা শেষ হলে ছেলেদের তিনি বললেন, আমপাতা। চিনতে পারছো?

সমস্বরে সবাই বলে উঠল, হ্যাঁ।

এবার দেখে দেখে আঁকো। যার আগে হবে তার আগে ছুটি।

সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই খাতার পাতায়। স্যার চেয়ারে বসে একটা বই খুলে পড়তে লাগলেন।

দুমিনিটে আঁকা হয়ে গেল আনুর। তখনো কারো হয়নি, তাই খাতাটা প্রথমে সে স্যারের কাছে নিয়ে যাবে, কেমন সংকোচ করল তার। সে চুপ করে বসে রইলো। তারপর দুতিন জন যখন খাতা দেখিয়ে বাড়ি চলে গেল তখন আনু উঠে দাঁড়াল।

স্যার তার খাতা দেখেই মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, বাহ্ তোমার আঁকবার হাত ভারী সুন্দর। নতুন ভর্তি হয়েছ? প্রশংসা শুনে লাল হয়ে ওঠে আনু। স্যার কি জানবে, আনু আরো কত কি আঁকে। সালু আপা মিনু আপা সবাইকেও ফুল পাতা না কত কী একে দেয় এমব্রয়ডারী করবার জন্যে। তার নসার ওপর ডি-এম-সি সুতো দিয়ে ওরা যখন নক্সাগুলো বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়ে তোলে, এত চমৎকার লাগে দেখতে। মনেই হয় না তার নিজের আঁকা।

দশের মধ্যে সাত নম্বর দিলেন স্যার। তার খাতাটা ক্লাশের সবাইকে দেখালেন। বললেন, তুমি আঁকবে আনু, রং দিয়ে এরপর থেকে আঁকবে। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব। আচ্ছা।

আনু আজই গিয়ে বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে রং-এর বাকস কিনে আনবে। তার ভারী উৎসাহ লাগে। স্কুল থেকে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তাকে ছুটি দিয়ে দেন ড্রয়িং স্যার।

ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, দারোয়ান বিল্টু বারান্দায় ঘণ্টার নিচে বসে বসে ঝিমুচ্ছে, কয়েকটা ক্লাশ ছুটি হয়ে গেছে আগেই, বেঞ্চগুলো খা খা করছে, টিউবওয়েল থেকে একটা ধুলোমাখ; বুড়ো লোক পানি টিপে খাচ্ছে। আনু দেখে জামরুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ইয়াসিন সেপাই, তাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

বারে, বাবাকে বললাম না, আমি একাই যেতে পারবো। ইয়াসিনকে দেখে আনু বলে ওঠে। তার হাত থেকে বই-খাতা নিয়ে ইয়াসিন হেসে বলে, হাঁ, হাঁ হামি মনে করলাম কে বড়সাবকে নিয়ে আসি।

আনুর ভারী মজা লাগে। বলে, তুমি আমাকে বড় সাব বলো কেন, ইয়াসিন?

আপনি যে বড় সাব আছেন, খোকাবাবু।

যাঃ!

হাঁ হাঁ, আপনি ভি বড় সাব হবেন। থানা মে বসবেন। হামি আপনার ঘোড়া দেখব, হাঁ।

লাল কাঁকর বিছানো টানা সড়ক দিয়ে হাঁটতে থাকে আনু। দুধারে প্রকাণ্ড গেটের মতো আড় হয়ে গাছের মাথাগুলো জড়াজড়ি করে আছে। যতদূর দেখা যায়, ভারী সুন্দর লাগছে। একেবারে শেষ মাথায় কার যেন একটা সাদা বাড়ি ছবির মতো দেখা যাচ্ছে।

একটা টমটম চলে গেল টকটক টকাটক করতে করতে। আনু বলে, ইয়াসিন, তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছ?

ইয়াসিন বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আনুর দিকে।

দূর, তুমি কিছু জানো না।

আপশোস করে ইয়াসিন বলে, আপনার মতো লেখাপড়া করলে তো জানবো খোকাবাবু। হামি তো জাহেল আছি।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় আনুর। জিগ্যেস করে, ইয়াসিন, বাবা মফস্বলে চলে গেছে?

হাঁ, দুপুরে তো গেলেন।

মনটা ম্লান হয়ে যায় আনুর। এতক্ষণ এই কথাটা তার মনেই ছিল না। ভাবছিল বাবাকে গিয়ে ইস্কুলের গল্প বলবে! হয়ত আজ রাতে আর ফিরবেন না বাবা।

পিন্টুর কথা মনে হয়। তাকে যদি রাস্তায় ধরে মারে? একটা বুদ্ধি আসে মাথায়। ইয়াসিনকে সে জিগ্যেস করে, তুমি কুস্তি করো?

বাপরে বাপ! হা, করে। কিউ?

আমাকে শিখিয়ে দেবে? আমি কুস্তি লড়বো। গায়ে জোর করবো। শেখাবে তুমি?

হাঁ, খুব। লেকিন খোকাবাবু, খুব ফজরে উঠতে হবে, ফের কাচ্চা চানা খাইয়ে লড়তে হবে।

ইয়াসিন খুব খুশি হয়ে যায়। সে সবে, আনু দারোগা হবে, বড় সাহেব হবে, থানায় বসবে। তাই কুস্তি শিখতে চায়। সে বলে, ফের খোকাবাবু, আপনাকে ঘোড়ায় সোওয়ারি ভি শিখিয়ে দেব। এহি তো মরদ কা মাফিক কাম আছে। কেতাব ভি পড়বেন ই সব ভি শিখে লিবেন। হাঁ।

বলতে বলতে বাসার কাছে এসে যায় তারা। বাসার কাছে এসে হঠাৎ একটা দৌড় দেয় আনু। এক দৌড়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখে বড় আপা বারান্দায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। তাকে দেখেই চিরুনি নামিয়ে উজ্জ্বল চোখ করে বললেন, এলি?

মা কোথায়?

বেড়াতে গেছে। তোর জন্যে দুধ-লাউ রেঁধেছি। মুখ ধুয়ে আয়। ইস্কুল কেমন রে?

আনু তার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলে-ওঠা গলায় বলে, এখানকার ছেলেরা এত খারাপ বড় আপা!

কেন, কী করেছে তারা?

খুব খারাপ। আমি কারো সঙ্গে মিশবো না।

আচ্ছা, আচ্ছা।

বড় আপা কোল থেকে ওকে নামিয়ে ওর রাঙা ক্লান্ত মুখখানা দেখেন।

৪. এত সুন্দর দোতলা বাড়ি

এত সুন্দর দোতলা বাড়ি তার চাচার, যেন আনুর বিশ্বাসই হতে চায় না। আর কী চওড়া তকতকে সিঁড়ি। সারাদিন দৌড়ে দৌড়ে উঠেও ক্লান্তি হয় না আনুর। চাচাতো ভাই মনির তার বয়সী, তার সঙ্গে ভাব হয়ে যায় এক মিনিটে। মনিরের সঙ্গে ছাদে উঠে সে ঘুরে ঘুরে শহর দেখে।

বাবার সঙ্গে আনু বেড়াতে এসেছে তার চাচার বাড়িতে, সিরাজগঞ্জে। তার আপন চাচা নয়, বাবার চাচাতো ভাই। বাবা নাকি ছোটবেলায় মানুষ হয়েছে এই চাচার মায়ের কাছে।

এসব কিছুই জানতো না আনু। মহিমপুর থেকে রওয়ানা দেবার কদিন আগে শুনেছে। কদিন থেকেই মা বাবাকে বারবার বলছিলেন এখানে আসতে। বলছিলেন, যাও না একবার ছোট মিয়ার কাছে। হাজার হোক নিজের মানুষ, তার কাছে শরম কিসের?

বাবা প্রতিবাদ করেন, শরমের কথা না। সে বড়লোক মানুষ, আমি কোনদিনই তার সাথে বেশি ওঠ-বোস রাখিনি। পছন্দই করিনি এসব। আজ কোন মুখে যাই! আর গেলেই বা কি ভাববে বলো?

সন্ধ্যায় বাতি জেলে আনু পড়ছিল। বারান্দায় বসে গলা নিচু করে আলাপ করছিলেন বাবা আর মা। বাবা নামাজ পড়ে জলচৌকি থেকে আর ওঠেননি। মা থাম ধরে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আনু উৎকর্ণ হয়ে ওঠে তাঁদের চাপা গলায় আলোচনা শুনে।

ভাবাভাবি আর কি? মেয়েগুলো কত বড় হলো একেকজন? তুমি তো বাসায় থাকো না, থাকি আমি। জ্বালা হয়েছে আমার।

মার গলা বুঝি ধরে এসেছিল। বাবা বিব্রত হয়ে বললেন, আহা, সে তো বুঝলাম।

অনেকক্ষণ পরে মা বলেন, আনুকে নিয়ে তুমি একবার সিরাজগঞ্জে যাও। ভিক্ষে তো আর আমরা চাই না। আস্তে আস্তে শোধ করে দেব, বলবে।

আচ্ছা, দেখি।

বাবার দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়। অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। আনু বুঝতে পারে বাবা দরুদ পড়তে শুরু করেছেন।

পড়ায় আর মন বসে না আনুর। জোর করে সে তাকিয়ে থাকে বইয়ের পাতার দিকে। অক্ষরগুলো যেন তার চোখ পোড়াতে থাকে। চোখে পানি এসে যায় তার। সে সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়।

ছোট দারোগার বউয়ের কথা মনে পড়ে যায় তার। সেদিন বেড়াতে এসেছিলেন। তেমনি সারা গা গয়নায় মোড়া, মুখে পাউডার, ঠোঁটে পানের পাতলা লাল রং, পায়ে হিলতোলা সোনালি স্যাণ্ডেল। আনু উঠোনে গাঁদা ফুলের গাছগুলো বাঁশের চিকন বাতা দিয়ে ঘিরে দিচ্ছিল তখন।

বারান্দায় বসে বসে মা-র সঙ্গে গাল ঠেসে ঠেসে পান খেলেন ছোট দারোগার বউ। বললেন. বুবু, একটা কথা কই। মেয়েদের বিয়ে দেন নাই যে, শেষে মুখে না কালি দেয়। শুনে অপ্রতিভ হয়ে যান মা। আমতা আমতা করেন। কিছুই বলতে পারেন না। ছোট দারোগার বউ পিচ্ করে পানের পিক ফেলে আনুকে একবার আড়চোখে দেখে গলা নামিয়ে বলেন, কিশোরগঞ্জে দেখেছি, এক ডাক্তার, তার যোয়ান মেয়ে, আপনার বড় মেয়ের মতো, বাপ মা খায়দায়, মনে করে মেয়ে আমার এখনো বাচ্চা। সে সর্বনাশী বাড়ির চাকরের সাথে, বুবু, ঘর ছাড়লো একদিন, আমার চক্ষের সামনে।

আনু তখন ভারী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কী একটা ছুতো খুঁজে সে বেরিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, এ কথা শোনা তার ঠিক হচ্ছে না। ভীষণ রাগ হয় ছোট দারোগার বউয়ের ওপর। তার এত মাথাব্যথা কেন? সে বুঝতেই পারে না বড় আপা মেজ আপা এদের বিয়ে দেবার জন্যে সবাই এত ভাবনা করে কেন? এমন কি তার বাবা-মাও বাদ যান না। তবু তাদের কথা শুনে খারাপ লাগে না আনুর, যতটা খারাপ লাগলো ছোট দারোগার বউয়ের কথা শুনে। আর পিন্টুর কথাও মনে পড়ে।

মনটা কালো হয়ে যায় আনুর। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতের বেতটা দিয়ে ঝোঁপঝাড়গুলো পেটাতে থাকে। কচি কচি বুনো গাছগুলো ভেঙে গিয়ে ঝাপালো একটা গন্ধ উঠতে থাকে। গন্ধটা ভারী ভালো লাগে আনুর। সে আরো পেটাতে থাকে। নেশার মতো তাকে পেয়ে বসে গন্ধটা।

ইয়াসিন কোথা থেকে এসে বলে, খোকাবাবু, হুঁশিয়ার থাকবেন, ই সব জঙ্গলে সাপ ভি থাকতে পারে।

আরে বাপ।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় আনুর খ্যাপা হাতটা। মুখে বলে, যাঃ।

কিন্তু চোখ তার সন্ধানী আলোর মতো দ্রুত ঘুরতে থাকে, কী জানি সত্যি সত্যি যদি সাপ টাপ বেরিয়ে পড়ে।

একটু পরেই আনু দেখতে পায় ছোট দারোগার বউ বেরিয়ে গেলেন তাদের বাসা থেকে। তার মুখটা গম্ভীর, আঁধার। অবাক হয়ে যায় আনু। একটু আগেই তো কী ডগমগে দেখাচ্ছিল বউটার মুখ।

ইয়াসিন বলে, কি খোকাবাবু। কুস্তি শিখবেন নাই?

ভুলেই গিয়েছিল আনু। সোৎসাহে সে বলে ওঠে, হ্যাঁ, শিখবো। কালকে। কাল তুমি ভোরে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও ইয়াসিন।

রাতে রান্নার ছিল দেরি। আপাদের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল আনু। ঘুম নয়, জাগরণ আর তন্দ্রা মেশানো একটা কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল আনু। এমন সময় ভারী মিষ্টি একটা ঘ্রাণ। আর নরোম একটা স্পর্শে সে আবিষ্ট হয়ে যায়। চোখ খুলে দেখে, বড় আপা তার পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তার পায়ের কাছে সেজ আপা বালিশে ওয়াড় পরাচ্ছেন। চোখ বুজে পড়ে থাকে আনু। তার এত ভালো লাগে, মনে হয় শূন্যে মেঘের ভেতরে ভেসে আছে সে। ভেসে ভেসে কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলে যাচ্ছে। তার কান্না পায়। বড় আপা, মেজ আপা কত ভালো। কিন্তু সবাই মুখ আধার করে থাকে, ফিসফিস করে কথা বলে। আনু ছাড়া কেউ ভালোবাসে না তাদের। আনু সারাজীবন এভাবে শুয়ে থাকতে পারে। কোথাও যাবে সে, কিচ্ছু করবে না।

মেজ আপা তার পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বলেন, ভাত খাবি না?

উঁ। না। খাবো না।

মেজ আপা তখন তাকে আদর করতে থাকেন খুব।

ওঠ না মনি, তোকে আজ একটা সুন্দর গল্প বলবো। ওঠ। ভাত খেতে খেতে বলব।

আদরটা এত মিষ্টি লাগছিল! আনু ইচ্ছে করেই জেদ করে, অনেকক্ষণ ধরে করে। বড় আপা তাকে কাধ ধরে উঠিয়ে দেন। বলেন, বাব্বাঃ, কি ভার হয়েছিস তুই আনু। আমি তুলতেই পারি না।

সে রাতে মেজ আপা ভাত মেখে দিল, ডিমের মতো মুঠো পাকিয়ে দিল, মুখে তুলে দিল, তবে খেল আনু।

রাতে শুয়ে শুয়ে আনু ভাবে তার চাচার কথা যাকে সে কখনো দেখেনি। সন্ধ্যের সময় বাবা আর মা-র কথাগুলো, মা তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে বলছিলেন, সেই সব ঘুরে ঘুরে ধূসর প্রজাপতির মতো মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। ও পাশের চৌকিতে বাবা শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাবার জন্যে ভারী মায়া করে আনুর। বালিশে মুখ গুঁজে সে পড়ে থাকে।

অন্যদিন হলে কোথাও যাবার নাম শুনে লাফিয়ে উঠতো আনু। আজ তার কী হয়েছে, বুকের মধ্যে কেমন টিপটিপ করছে, এখান থেকে, এ বাসা থেকে, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। তার। বড় আপার ফর্সা চেহারাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মাথায় একটি ছোট্ট টিপ। চিবুকের কাছে একটুখানি ভাজ। আনু আয়নায় দেখেছে তার চিবুকেও ওরকম ভাজ আছে। তার মায়েরও আছে। বড় আপা যখন হাসেন ভাজটা ছড়িয়ে যায়, কী সুন্দর লাগে! ইয়াসিনের কাছে কাল থেকে সে কুস্তি শিখবে। পিন্টু যদি তাকে মারতে আসে, এবার এমন একটা ঘুসি দেবে তাকে যে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে শয়তানটা।

বাবার যদি অনেক টাকা থাকতো, তাহলে ভাবনা ছিল না। আনু স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার বাবার টাকা নেই, মা তাই চাচার কাছে যেতে বলছেন। চাচার কাছ থেকে টাকা আনবে বাবা? চাচা বোধহয় খুব রাগী। নইলে বাবা যেতে চাইলেন না কেন? মা অনেক করে বলতে তবে রাজি হলেন তিনি। আনু যেন বাবার সঙ্গে মিশে যায়। আনু বুঝতে পারে, বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবার যেতে ইচ্ছে করছে না। আনু যদি একলাফে বড় হয়ে যেতে পারতো, তো অনেক টাকা রোজগার করে ফেলত সে। পানু ভাই একটা চাকরি পেলেও হতো। তাহলে আর কোনো ভাবনা থাকত না। আনু বারবার পাশ বদলাতে থাকে বিছানায়, কুণ্ডলি পাকিয়ে শোয়, আবার পরক্ষণেই সোজা হয়।

বাবা ডাকেন, আনু, ও আনু।

তখন ঘোরটা কেটে যায় আনুর। বাবা পাশে এসে দাঁড়ান। মা ও ঘর থেকে বলেন, কি হলো?

কিছু না, ছেলেটা কেমন কাতরাচ্ছে।

কপালে হাত দিয়ে দেখেন বাবা। না, জ্বর আসে নি। বাবা আবার ডাকেন, আনু, আনু রে।

আনু ঘুমজড়িত গলায় বলে, কী?

ও রকম করছিস কেন?

চুপ করে থাকে আনু।

আয় আমার সঙ্গে শুবি।

আনুকে প্রায় কোলে করে বাবা তার নিজের বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেন। বলেন, খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস? ভয় কিরে, এই তো আমি এ ঘরেই আছি।

একটু একটু হাসেন বাবা। আনুর তখন ভীষণ ঘুম পায়। বাবার হাতটা ধরে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। একেবারে সেই ভোরবেলায় ঘুম ভাঙে তার। সালু আপা বলে, আনু, আজ তোকে নিয়ে বাবা সিরাজগঞ্জে যাবে, চাচার কাছে।

আজ?

আনুর যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। বিছানা ছেড়ে ওঠে না। সালু আপা তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলে, আমি মিথ্যে বলছি? যা মাকে জিগ্যেস কর। আমার বয়েই গেছে। গটগট করে বেরিয়ে যায় সালু আপা। তখন যেন বিশ্বাস হয় আনুর।

সেই আসা। আসবার উত্তেজনায় আনু ভুলেই গিয়েছিল বাবা কেন চাচার ওখানে যাচ্ছেন, কেন যেতে চাননি, তার যেতে ইচ্ছে করেনি।

সিরাজগঞ্জ বাজারে এসে ট্রেন থামলো। নামলো ওরা। মা এক বোয়াম মোরব্বা বানিয়ে দিয়েছিলেন চাচাঁদের জন্যে, আনুর হাতে সেটা। বাবা বললেন, সাবধানে আনু। বাড়ির কাছে এসে দেখিস ভাঙে না যেন।

আত্মীয়স্বজন বলতে কাউকে চেনে না আনু। বাবা কোনদিন কারো কথা বলেন না। এক মামা আছেন, তাও মা-র সৎ-ভাই। আনু শুনেছে, সৎ-ভাই নাকি খুব শয়তান আর হিংসুটে হয়। তাই তার বড় একটা টান নেই মামার ওপর। মিনু আপাকে সেদিন মামা নিয়ে গেল। ঘরে এসে মিনু আপা চোখ বড় বড় করে কত গল্প করল মামা বাড়ির, আশ্চর্য সব গল্প—- আনুর বিশ্বাস হতে চায় না।

এ চাচাও যে এতদিন কোথায় ছিলেন কে জানে। এই সেদিনই আনু প্রথম শুনলো, ওর এক চাচা আছেন, বাবার চাচাত ভাই; বাবার কোনো আপন ভাই নেই। একজন ছিল, বসন্তে মারা গেছে সেই ছোটবেলায। বাবা তাকে নিয়ে যখন ছোটবেলায় স্কুলে যেতেন, বাবা একবার গল্প করেছিলেন, পথে একটা খাল পড়ত, সেই খালটা ভাইকে কাঁধে করে পার হতেন। বাবা বলতেন, আমি দুঃখ কষ্ট করে একাই মানুষ হয়েছি। কেউ তো আর আমাকে দেখেনি। এখন আমার কি দরকার সেধে সেধে তাদের সাথে আত্মীয়তা করবার?

চাচার কাছেও আসতে চাননি বাবা। মা বারবার করে বলাতে এসেছেন। তাদের রিকশাটা দুপাশে লাইব্রেরী, স্টেশনারী, ওষুধের দোকান, ছাপাখানা, চায়ের স্টল পেরিয়ে

চলেছে। সকাল বেলা বড় বড় মাছ উঠেছে বাজারে। বাজারের কাছে এসে রিকশা থামাতে বলল বাবা। আনুকে বললেন, বোস আমি আসছি।

পাঁচ মিনিট পরে বাবা একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ নিয়ে ফিরলেন। দড়ি দিয়ে তার কানকোর ভেতরে ফোড় করে বাঁধা। কানকো দেখাচ্ছে লাল টকটকে। আনু অবাক হয়ে যায়। বাবা বলেন, কারো বাড়িতে খালি হাতে যেতে নেই মাছটা বেশ বড় না?

হ্যাঁ।

রিকশা আবার চলতে লাগল। বাবাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আনু চুপ করে দুধারের অচেনা বাড়িঘর দেখতে থাকে। একটা উঁচু ব্রীজের নিচে এসে পৌঁছলো ওরা। ব্রীজটার ওপরে রিকশা টেনে টেনে পার করতে হবে। বাবা নেমে গেলেন। আনু রইলো রিকশায়। বাবা পাশে পাশে হেঁটে এলেন। তারপর ও-মাথায় গিয়ে আবার রিকশায় ওঠে বসলেন তিনি। এ ব্রীজটার নাম এলিয়ট ব্রীজ। এইটুকু হেঁটেই যেন হাঁফিয়ে গেছেন বাবা। মুখ ঘামে ভিজে গেছে। চকচক করছে তার সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি। বাবা দুহাতে মুখ মুছলেন অনেকক্ষণ ধরে।

বাসায় এসে চাচাকে পাওয়া গেল না। চাচা ঢাকায় গেছেন কাজে, কাল ফিরবেন। চাচি বিরাট ঘোমটা টেনে বাবার সামনে এসে সালাম করতে গেলেন, বাবা বললেন, থাক, থাক। মনির এক লাফে কোথা থেকে এসে মোরব্বার বোয়ামটা কেড়ে নিয়ে গেল আনুর হাত থেকে। বাবা হেসে বললেন, ও তোর ভাই। মনির।

সিঁড়ির পাশে ছোট্ট ঘরটায় থাকবার ব্যবস্থা হলো তাদের। আনুর ভারী ইচ্ছে করছিল, দোতলায় যদি থাকতে পারতো। দোতলায় কোনোদিন থাকেনি সে। না জানি, কেমন ভালো লাগে দোতলায় ঘুমোতে। মনির থাকে দোতলায়।

ভারী ভাব হয়ে গেল মনিরের সঙ্গে। আনু তার সব বই উলটে পালটে দেখল, সেও তার মতো ফোরে পড়ে। তার খেলার বন্দুকটা নিয়ে শিখে নিল কেমন করে ছুঁড়তে হয়। বলল, আমার বাবার সত্যিকার রাইফেল আছে, পিস্তল আছে। আমাকে গুলি মারতে শেখাবে বলেছে।

তারপর মনিরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল টাউন দেখতে। এলিয়ট ব্রীজের ওপর হেঁটে হেঁটে পার হতে ভারী মজা লাগল আনুর। আহা, এরকম একটা ব্রীজ মহিমপুরে যদি থাকতো!

বিকেলে ফুটবল খেলতে নিয়ে গেল মনির। সেনবাবুদের মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলে। চরদীঘির রাজা নাকি সেনবাবু। এখন কলকাতায় চলে গেছে। বিরাট বাড়িটা, মাঠটা, পুকুরটা পড়ে আছে। কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ভুতুড়ে বাড়ির মতো। ছেলেরা তাকে দেখে ঘিরে দাঁড়াল। সে তো নতুন, তার কেমন লজ্জা করতে লাগল তখন। ফুটবলের মাঠে একটা বলও সে কিক করতে পারল না। বল তার সামনে দিয়ে চলে যায়, ভাবে ওরাই কেউ কিক করুক, আনুর সংকোচ আর কাটে না। মনির দমাদম দুটো গোল করে। তারপর খেলা শেষে সবাই একসঙ্গে চিৎ হয়ে শুয়ে গল্প করতে থাকে। আনু পাশে বসে ঘাস ছেড়ে একটা একটা করে। ওদের একটা কথাও সে বুঝতে পারে না। কাকে যেন

জব্দ করবে সেই বুদ্ধি আঁটছে ওরা। কাল স্কুলে গেলে যে ছেলেটা জব্দ হবে তার কথা ভেবে আনুর বড় মায়া করে। রাতে বাবার পাশে শুয়ে আর ঘুম আসে না। অচেনা সব শব্দ উঠতে থাকে দূর দূরান্তর থেকে, অন্ধকারে ভেতর শেয়াল ডাকে, ঝি ঝি পা ঘষে ঘষে কান অবশ করে ফেলে, কোথায় কে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়, সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দ নামে, ওঠে, আবার নামে; মা–বড় আপা–মেজ আপা–সালু আ৮ ছোট আপা–মিনু আপা কি করছে এখন? এখন ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে না, গল্প করছে। আনুর কথা বলছে। আনু বেড়াতে গেছে সেই কথা বলছে। কদিন আগে বাবা একটা কলেজ পড়া ছেলেকে জায়গীর রেখেছেন সেই মাস্টার সাহেব বোধহয় ল্যাম্প জ্বেলে মোটা মোটা বই পড়ছেন। মাস্টার সাহেবের জন্যে ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে, অনেক রাতে খান। আনুকে একটা ছবির বই এনে দিয়েছিলেন মাস্টার সাহেব। আবার একসঙ্গে অনেকগুলো শেয়াল ডেকে ওঠে। তন্দ্রার ভেতর থেকে চমকে ওঠে আনু। এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর তলিয়ে যায় ঘুমে।

চাচা ভোরবেলায় এসে পৌঁছুলেন। বাবাকে দেখে ভারী খুশি হলেন তিনি। না, আনু যেমন ভেবেছিল, খুব রাগী হবেন চাচা, তেমন একটুও না। গোলগাল মুখ, ফর্সা, ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরনে আর লাল পাম্পশু পায়ে, হাতে মস্ত বড় একটা আংটি। ট্রেন থেকে নেমে এসে আর কাপড় বদলালেন না, হাত মুখ ধুলেন না, বাবার সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করতে লেগে। গেলেন। ডেকে বললেন, এই কি আনু? শোনো বাবা, দেখি, দেখি।

আনু এসে সামনে দাঁড়াল। বাবা বললেন, সালাম কর।

করলো সে। চাচা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ভারী সুন্দর হয়েছে। বাপের মতো বড় হওয়া চাই, বুঝলে আনু? খালি সুন্দর চেহারায় কিছু হয় না।

লাল হয়ে যায় আনু। বাবা বলেন, আমি আর কী? আমার চেয়েও বড় হোক সেই দোয়াই করি। পুলিশের চাকরি আবার চাকরি? লোকে মনে করে পয়সাই পয়সা। দারোগারা লাল হয়ে গেল। এদিকে খবর নিয়ে দেখ, আমার একদিক দেখতে আরেকদিক কানা হয়ে যায়। এইরকম আক্ষেপ করে চলেন বাবা। একা একা। চাচা চুপ করে শোনেন। পরে বলেন, কী যে বলেন মিয়াভাই। আপনাদের অভাব? এই তো সেদিন সিরাজগঞ্জে এক বাচ্চা দারোগা এলো, তার...।

তাকে শেষ করতে দিলেন না বাবা। বাধা দিয়া বললেন, সবাই কি আর একরকম? ধর্ম যদি পানিতে ফেলা যায়, তাহলে আলাদা কথা।

রাখেন আপনার ধর্ম! আপনি সেই পুরনো কালের ধ্যান নিয়ে আছেন। যুগ এখন অন্য রকম। এখন ও–সব চলে না।

প্রায় তর্ক লেগে যায় বাবা আব চাচার। ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে সরে আসে আনু। বাবার মুখটা কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে একমুহর্তে, চেনাই যাচ্ছে না আর। আর চাচার ফর্সা চেহারা লাল হয়ে গেছে উত্তেজনায়। আনু চুপ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। নামলে রান্নাঘর দেখা যায়। দুজন কাজের মেয়ে সনার জোগাড় করছে। চাচি একটা মোড়ায়

বসে পাখা হাতে তদারক করছেন। আনুকে দেখে ডাকলেন তিনি। বললেন, এই ছেলে, শোন।

কাছে এলো আনু। আনুর খুব খারাপ লাগলো তখন। তার মা আর বড় আপা রোজ নিজ হাতে রান্না করেন। গরমে, কালিতে, ধোঁয়ায় কী বিচ্ছিরি দেখায় তাদের। এরকম কাজের মেয়ে যদি থাকতো, তাহলে আর কষ্ট হতো না। চাচিকে কী সুন্দর ছিমছাম দেখাচ্ছে! মাকে বলবে।

চাচি তাকে কাছে ডেকে তার মায়ের তার বোনদের গল্প শুনতে লাগলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করলেন কত কথা। কে দেখতে কেমন, কে কত বড়, কোথা থেকে বিয়ের কথা আসছে। আনু তার অত কি জানে সে ভাল করে কিছুই বলতে পারল না। বলতে ইচ্ছে করল না। আনু খুব বিব্রত বোধ করল, লজ্জা করল তার। সে তো জানে বাবা তার আপার বিয়ে দেবেন বলে টাকা চাইতে এসেছেন চাচার কাছে।

সেরাতে অনেকক্ষণ ধরে আবার আলাপ করলেন বাবা আর চাচা। ভাত খাবার পর আনু দোতলায় মনিরের পড়ার টেবিলের পাশে বসে রইলো। মনিরকে একটা ফুলের তোড়া এঁকে দিল আনু। মনির অবাক হয়ে আঁকাটা দেখল, তারপর আরো এঁকে দেবার জন্যে বায়না ধরলো। তখন পাতা, লাটিম, কলম একে দিল আনু। সবশেষে একটা ছবি আঁকলো সে–একটা বাড়ি, পাশে নদী বয়ে যাচ্ছে, তালগাছ কাৎ হয়ে পড়েছে, আকাশে মেঘ, মেঘের মধ্যে সূর্য।

বলল, রং নেই তোর?

না।

রং থাকলে কী সুন্দর রং করে দিতাম।

না হোক। এমনিই ভালো।

মনিরের একটা মজার খেলা ছিল। চোং-এর মধ্যে ভাঙা চুড়ির অনেকগুলো টুকরো আর একটা ঘষা কাঁচ বসানো। একদিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে চোংটা ঘোরালে নতুন নতুন নকশা তৈরি হয়! এমন অদ্ভুত খেলা জীবনে দেখেনি আনু। সেইটে অবলীলাক্রমে মনির দিয়ে দিল তাকে।

ঠকঠক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন চাচা। তাকে ভারী গম্ভীর দেখাচ্ছে। আনু ভয় পেয়ে খেলাটা মনিরকে ফিরিয়ে দিল, বলল, কাল নেবো ভাই।

তারপর নেমে এলো নিচে। এসে দেখে বাবা এশার নামাজ পড়তে বসেছেন। চোখ বোজা, ঘরে আলোটা ছোট করে রাখা। নিবিড় একটা ছায়ার মতো মনে হচ্ছে বাবাকে। নিঃশব্দে আনু গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

পরদিন সকালে ফিরে যেতে চাইলেন বাবা। চাচা বললেন আরো একদিন থেকে যেতে। আরো একদিন থেকে গেল ওরা। তারপর দুপুর এগারোটার গাড়িতে উঠল।

গাড়িতে উঠে আনু জিগ্যেস করল, টাকা দেয়নি বাবা?

বাবা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। তুই শুনলি কোত্থেকে?

আনু চোখ নামিয়ে নিল। থতমত খেয়ে গেল সে। তার জিগ্যেস করাই উচিত হয়নি। বাবা টের পেয়ে গেলেন, সেদিন সন্ধ্যেয় মার সঙ্গে বাবার কথাগুলো সব সে শুনেছে।

বাবা কিছু বললেন না আর। তার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আনুর মনে। হলো, সে মাটিতে মিশে যায়। বাবাকে ক্লান্ত, বিষণ্ন দেখাচ্ছে। আনুর কেন যেন মনে হলো, টাকা দেয় নি চাচা। কিন্তু বাবার মুখের দিকে আর তাকাতে সাহস পেল না সে। ট্রেন ছুটে চলেছে চাকায় চাকায় ছড়া কাটতে কাটতে। আনু সেইটে কান পেতে শুনতে লাগল—- ঢাকা যাবো, টাকা পাবো—-ঢাকা যাবো, টাকা পাবো—-ঢাকা যাবো, টাকা পাবো।

৫. সকালবেলার লাল আলো

সকালবেলার লাল আলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। মহিমপুরের নির্জন পথে এখনও এখানে ওখানে লেগে রয়েছে অন্ধকার।

আনু ঘুমিয়েছিল। সালু আপা তার চোখে ফোঁটা ফোঁটা পানি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। বিরক্ত হয়ে চোখ মেলে আনু জিগ্যেস করল, কী?

কিন্তু তার বিরক্তি চোখেই পড়ল না সালু আপার। বরং খুশিতে ডগমগ হয়ে সে বলল, ফুল কুড়োতে যাবিনে? দেখ তো বেলা কত হয়েছে?

আরে তাই তো! ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে আনু জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। নিম গাছটার নিচে, রান্নাঘরের পেছনে বিরাট লাল সূর্য আস্তে আস্তে ভেসে। উঠছে আকাশে। তার অভিমান হলো সালু আপার ওপর। বলল, তুমিই তো বেলা করলে! আমাকে আরো আগে ডাকলে না কেন? ঠিক ও বাড়ির খোকা এসে সব ফুল এতক্ষণে নিয়ে গেছে।

তবু ঘর থেকে বেরোয় আনু। মনটা কেমন খুঁতখুঁত করে তার। আর একটু সকালে উঠলেই কেমন তাজা শিউলি পাওয়া যেত। শিশির ভেজা ঘাসে পা ডুবিয়ে ফুল কুড়োতে যা মজা! এত বেলা করে গিয়ে শুধু শুধু বাসি ফুল কুড়োনো বইত আর কিছু নয়।

পথে বেরিয়ে আনুর ভারী ভালো লাগল শীতসকালের আমেজ ভরা শহরটিকে। মাত্র কয়েকমাস হলো ওরা এসেছে মহিমপুরে। এটা নাকি মহকুমা সদর। কিন্তু হলে হবে কী, শুনতেই যা। বর্ষাকালে কাদায় যদি ঘর থেকে এক পা বেরুনো যায়। যেদিকে তাকাও শুধু পানি আর কাদা। আবার যখন গরম পড়ে তখন পথে এত ধুলো ওঠে যে, আনুদের কোয়ার্টার থেকে থানা এক মিনিটের পথ, এইটুকু হেঁটে যেতেই হাঁটুভর্তি ধুলো হয়ে যায়। আনুর শুধু ভালো লেগেছে এই শীতকালটা। লেপ মুড়ি দিয়ে মিটমিট করে চোখ খুলে জানালা দিয়ে পথটাকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। কেমন পাথরগুলো ভিজে গিয়েছে শিশিরে। লালমাটি বিছিয়ে রয়েছে পুরু কাঁথার মতো। আর থানার পেছনে বড় শিউলি গাছটা অ্যাতোগুলো ফুল ছড়িয়ে রেখেছে ঘাসের ওপর। সালু আপার সাথে রোজ ফুল কুড়োতে আসে আনু। এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গাছটার দিকে। ডালগুলো বুড়ো হয়ে গেছে, পাক ধরেছে, বাকল উঠে গেছে, তবু তারি গায়ে চিকন চিকন ডাল বেরিয়েছে, সেই ডালে ফুল। সালু আপা ধমক দেয় একেকদিন, হাঁ করে গাছ দেখলে কি আর ফুল কুড়োনো যায়? নিশ্চয় পোকা এখুনি এসে পড়বে। তখন নিসর্গে ফুল।

আবার তখন দুহাতে ফুল কুড়োতে শুরু করে আনু। ও আবার বলে, আনু গাছে উঠতে পারবি?

একবার গাছটায় চোখ বুলিয়ে নেয় অনু! পরে বলে, হুঁ।

তবে ওঠ। উঠে ডানদিকের বড় ডাল ধবে ঝকালে কিন্তু মেলা ফুল ঝরবে। তুই ওঠ।

তারপর ঝুরঝুর করে, ডাল থেকে নাড়া পেয়ে, আরো কত শিউলি যে ছড়িয়ে পড়ত তার আর হিসেব নেই।

একেকদিন বাবা আসতেন আনুদের সাথে। অনুরা ফুল কুড়িয়ে তখন জমা করত তাঁর কাছে। তারপর তিনজন একসঙ্গে ফিরে আসতে বাসায়। বাসায় এসে চা–মুড়ি খেতে খেতে মালা গাথতো সালু আপা, আনু একটা একটা করে ফুল তুলে দিত তার হাতে। বাবা কিন্তু আনুদের আসবার অনেক আগেই শিউলি গাছের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেখানে গিয়ে পায়চারি করতেন আর আনতস্বরে সুর করে সুরা পড়তেন। ভারী মিষ্টি গলা ছিল বাবার। কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করত আনুর। আকাশ থেকে আসা অশরীরি গানের মতো মনে হতো তার।

কোনো কোনো ভোরসকালে ঘুমের ঘোরে আনু শুনতে পেত, বাবা নামাজ পড়ছেন। দীর্ঘ কোন এক সুরা করুণ সুরে আবৃত্তি করে যেতেন তিনি। আনু তন্ময় হয়ে যেত শুনতে শুনতে। কেন যেন তার পানি এসে যেত চোখে। বালিশে মুখ গুঁজে নিস্পন্দ পড়ে থাকত সে।

আজ তাড়াতাড়ি শিউলি তলায় আনু সালু আপাকে নিয়ে গিয়ে দেখে, বাবা সেই কখন থেকে সেখানে পায়চারি করছেন। পথের দুধারে নিবিড় গাছপালা আর বড় বড় আমগাছ। আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাবা সুরা পড়ছেন। চোখ দুটো তাঁর প্রায় বুজে এসেছে। ওদের দেখে তিনি আনমনে একটু হাসলেন। তারপর আরো কিছুক্ষণ সুরা পড়ে কাছে এসে বললেন, কিরে, এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলো তোদের? আরো:সকাল করে উঠবি। খুব

সকালে উঠবি। শুধু ফুল কুড়োনোর জন্যেই কি এত ভোরে ওঠা?তারপর বিশেষ করে আনুকেই যেন তিনি বলেন—-বড় বড় লোক, তারা সব খুব ভোরে উঠতেন। এক্কেবারে ভোরে। কাকপাখির নামগন্ধ নেই পর্যন্ত তখন।

সালু আপা আনুর হাত ধরে টানে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে। ক্রমেই থালার মতো সূর্য জেগে উঠছে আকাশে। আর তারই লাল আলোয় বাবার মুখখানা রাঙা দেখাচ্ছে। তিনি বলে চলেছেন, আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ, মেকস ম্যান হ্যাপি অ্যান্ড ওয়াইজ।

আনু ঠিক বুঝতে পারল না কথা কটির অর্থ। বাবা তাকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, যাও ফুল কুড়োওগে তাড়াতাড়ি। নইলে বাসায় আবার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ফুল কুড়োতে কুড়োতে আনু ভাবে, বাবা কত ভোরে ওঠেন। নিশ্চয়ই বাবা অনেক বড়। বাবার মতো বড় কেউ নেই।

বাসায় ফিরে এসে দেখে বড় আপা আর মেজ আপা তখন চায়ের জোগাড় করেছেন। সেজ আপা রাতের বিছানাগুলো ঝাড়ছেন। লেপগুলো ভাজ করে তুলে রাখছেন। মেজ আপাকে তার নাম ধরে একেকসময় আনু ডালু আপাও বলে ডাকে। ডালু আপা বলতে ভারী মিষ্টি লাগে আনুর।

আর মিনু আপার শুধু শুধু শয়তানি মতলব। কাজকর্ম কিছু করবে না, কিন্তু ভাব করে যেন কত কী রাজকার্যে ব্যস্ত। আনু গিয়ে রান্নাঘরে বড় আপার আঁচল ঘেঁষে বসে

পড়লো। তিনি ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, এ দেখেছ আনু এখনো মুখ ধোয়নি, চা খেতে এসেছে। যা শীগগীর করে মুখ ধুয়ে আয়।

কী আর করে আনু। বাবা শুনলে খুব রাগ করবেন। শীতকালে মুখ ধুতে যা কষ্ট! গাল–মুখ চোখ ঠাণ্ডা পানিতে যেন কেটে যেতে চায়। গুটি গুটি পায়ে কুযযার পাড়ে আসে আনু। এসে দেখে, মা কাপড়ে সাবান দিয়ে রাখছেন। এতে দুপুরবেলায় যখন ধোওয়া হবে, ময়লা কাটবে ভালো। মাকে অত সকালে কাপড়ের স্তূপ নিয়ে কুয়োর পাড়ে বসতে দেখে কেমন মায়া করলো আনুর। মনিরের মা–র কথা মনে পড়ল। তাদের মতো ঝি থাকলে মার আর কোন কষ্ট ছিল না।

মনিরের কথায় সেই অবাক করা খেলনাটার কথা মনে পড়ে গেল। চোং–এর ভেতরে চোখ রেখে ঘুরোলেই ভাঙা চুড়ির টুকরোগুলো নতুন নতুন নকশা হয়ে ওঠে। বড় আপার খুব পছন্দ হয়েছিল ওটা। বড় আপা একেকদিন আনুর হাত থেকে খেলনাটা নিয়ে বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে নকশার খেলা দেখতেন। তখন তার মুখে ফুটে উঠত আবছা একটা হাসি, যে হাসিটা কোনদিন ভুলতে পারবে না আনু। অস্পষ্ট এক চিলতে একটা হাসি, ঈদের চাঁদের মতো, দেখা যায় কিনা, আনু একটু চোখ বুঝলেই একেবারে স্পষ্ট দেখতে পায়। হাসিটা তার মনকেও অজান্তে কখন প্রসন্ন করে তোলে।

মুখ ধোবার জন্যে পানি তুলে দিলেন মা। বললেন, ফুল কুড়োনো হয়ে গেল এরই মধ্যে? ধন্যি ছেলে, নিত্যি নিত্যি ফুল কুড়োনো চাইই চাই। কী হয় বাপু এত শিউলি এনে?

অভিমান হয় আনুর। বলে, কেন, সালু আপাই তো বলেছে শিউলির বোটা দিয়ে রঙ হয়। সেই রং-এ তুমি নাকি জরদা করবে।

মা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর তাড়াতাড়ি বললেন, আচ্ছা যা, তুই চা খেয়ে পড়তে বোস। খালি বেড়ানো!

আনু বুঝতেই পারে না, মার মেজাজ আজকাল এত তেতো হয়ে যাচ্ছে কেন। সে আস্তে আস্তে উঠে আসে।

বড় ঘরের বারান্দায় সবাই গোল হয়ে বসেছে চা খেতে। হঠাৎ আনুর নজরে পড়ায় চিৎকার করে ওঠে, দেখেছ বাবা, মিনু আপা কতগুলো দুধ ঢাললো ওর কাপে। দেখেছ?

আহা নিক। তুইও নে।

এত মিষ্টি করে বললেন বাবা যে আনুর মনটা ঝিরঝির করে উঠল। সেও ভাবলো, নিক না। মিনু আপা সারাক্ষণ তার সঙ্গে দুষ্টুমি করে, জ্বালাতন করে মারে, সে সব কিছুই এখন মনে পড়ল না আনুর। সে এক মুঠো মুড়ি তার কাপে ঢেলে সুড়ৎ সুড়ৎ করে খেতে লাগল। চায়ের সঙ্গে ভারী স্বাদ হয়েছে। ও-রকম চায়ে মুড়ি ঢেলে সালু আপা মিনু আপাও খাচ্ছে। মেজ আপা সঙ্গে বসেননি। তিনি একটা থামে ঠেস দিয়ে খাচ্ছেন। ছবির মতো লাগছে।

চা খেতে খেতে বাবা মাকে বললেন, আমার সুটকেশ গোছানো হয়েছে?

কেন?

উদ্বিগ্ন হয়ে আনু জিগ্যেস করে। উত্বে দেন মেজ আপা, বাবা আজ মফস্বলে যাবে আনু।

সত্যি?

আনুর যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

হ্যাঁ।—বাবা বললেন।

তাহলে কবে তুমি আসবে?

তার কি ঠিক আছে? কাজ যদ্দিনে হয়। এই দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরব আমি।

শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় আনুর। আনমনে চায়ের কাপে চুমুক দেয় সে। নতুন করে মুড়ি নিতে ভুলে যায়। একেবারে কিছুই আর ভালো লাগে না তার।

কেন যে বাবা বেছে বেছে এই থানার চাকরিটা নিয়েছেন, ভেবেই পায় না আনু। খালি অভাব আর অভাব। তার ওপর একদিনের জন্যে সুস্থির নেই। আজ এখানে কাল

সেখানে এই করে। মাসের অর্ধেকটাই বা বাইরে বাইরে কাটান। আর যখন তিনি থানার অফিসে এক গাদা কাগজপত্র নিয়ে বসে থাকেন তখন কেমন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে আনুর মন। মনে হয় তিনি বুঝি আনুর বাবা নন। কেমন গম্ভীর আর দৃঢ় মুখখানা। দেখে ভয় করে আনুর। পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করে। তাই পারতপক্ষে আনু কোনদিন থানার পথ মাড়াতো না। কত ছেলের বাবা কত কী কাজ করে। তার এক বন্ধু ছিল ডাক্তারের ছেলে। তার বাবা কানে স্টেথিসকোপ লাগিয়ে বুক দেখতেন, ইঞ্জেকশন দিতেন, আবার ঘোড়ায় চড়ে রুগী দেখতে যেতেন দূর দুর গাঁয়ে। মাথায় শোলার হ্যাঁট, প্যান্ট পায়ের কাছে জড়িয়ে ক্লিপ দিয়ে আটকানো, একপাশে। ঝোলানো ওষুধের কালো ব্যাগটা ঘোড়া চলতো আস্তে আস্তে, বেশ লাগতো আনুর। দুপকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ফিরতেন তিনি আর আনতেন আম, লিচু, না হলে পাকা পেপে। পিন্টুর বাবাও বেশ। পিন্টুর বাবা বকশীবাবু অস্ট্রেলিয়া বিলাত কত জায়গায় পাট পাঠান, ইচ্ছা করলে নিজেও যেতে পারেন, যান না। মনিরের বাবার কাজও কত সুন্দর। মাসের মধ্যে চারবার ঢাকা যাচ্ছেন। ওদের মিল বসছে সিরাজগঞ্জে, কাপড়ের মিল। মনিরের বাবা কত বড় লোক। দোতলা বাড়ি। মনির রোজ ছাদে উঠতে পায়। ছাদে উঠতে এত মজা লাগে আনুর!

খুব ভোরে যারা ওঠেন তারা নাকি বড় লোক। বাবাও তো বড় লোক। বাবা তবে কেন অমন বিশ্রী একটা চাকরি করেন? চোর ঠ্যাঙ্গায় বলে ছেলেরা তাকে ঠাট্টা করে। আবার কেউ কেউ বলে দারোগার ছেলে পাজি হয়, মিশতে চায় না তার সঙ্গে।

সেজ আপা একদিন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যারা বলে আনু, তাদের বলবি, দারোগা না থাকলে তোদের বাড়িতে চুরি হলে কি করবি? একেবারে ফকির হয়ে যাবি।

মুখে মুখে কথার জবাব আনু কোনদিন দিতে পারে না। সেজ আপা শিখিয়ে দিলেও তা আর বলা হয় না।

মাস্টার সাহেবের কাছে পড়ছিল আনু। তিনি বললেন, আজ তোমার কী হয়েছে?

কিছু না।

তো পড়ছ না কেন?

বারে, পড়ছি তো।

বলে আনু মন দেয় বইয়ের পৃষ্ঠায়। এবার সত্যি সত্যি মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকে সে। আর মাস্টার সাহেব তার কলেজের বই খুলে নিজেও পড়ছেন। আনুর খুব ভালো লাগে মাস্টার। সাহেবকে। রোজ সকালে সাড়ে নটার ট্রেনে রংপুর যান কলেজ করতে। আবার ফিরে আসেন সন্ধ্যায়। বাবার কাছে সে শুনেছে, মাস্টার সাহেব নাকি খুব গরিব, কষ্ট করে যারা লেখাপড়া করে তারা অনেক বড় হয়। আনু খুব খুশি হবে, যেদিন মাস্টার সাহেব পাশ করে খুব বড় চাকরি করবেন।

আনুকে একটুও বকেন না মাস্টার সাহেব। বাড়িতে থাকলেও মনে হয় বাড়িতে নেই। একটুও সাড়া পাওয়া যায় না। বাইরের ঘরে চুপচাপ পড়ে থাকেন। আনুকে কত অদ্ভুত

সব ছবি এনে দেন, বিলিতি ছবি, কাগজ থেকে কাটা ছবি। আনুকে একটা খাতা করে দিয়েছেন; সেই খাতায় ছবিগুলো সেঁটে রাখে আনু। অবসর সময়ে বসে বসে দেখে। কত দেশের ছবি, গম ক্ষেতের ছবি, হ্রদের ছবি, পাহাড়-পর্বতের ছবি। পাহাড় দেখতে এত ভালো লাগে আনুর প্রথম যেদিন ধরলার পাড়ে ভোর বেলায় বাবার সঙ্গে সে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখল, রোদে এক মুহূর্তের জন্যে ঝলমল করে উঠেই আবার নীল হয় চূড়াটা, আনুর মনে হলো জেগে জেগে এক অপূর্ব রঙিন স্বপ্ন দেখছে সে।

বড় আপা ভেতর থেকে দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আনুকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলেন, মাস্টার সাহেবকে ভাত দেব নাকি জিগ্যেস কর।

মাস্টার সাহেব হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, আজ ছুটি। ঈদে মিলাদুন্নবী। কলেজ নেই আমার।

তাই তো! আনুরও মনে ছিল না, আজ তার স্কুলও বন্ধ। বড় আপা আরো এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন তখন। মাস্টার সাহেব এতক্ষণ বইয়ের পাতায় মনোযোগ রেখেছিলেন, চোখ তুলে খুব ঝরঝরে গলায় বললেন, পড়ো আনু পড়ো। সময় নষ্ট করতে নেই।

বাবা চলে গেলেন বেলা দশটা নাগাদ। যাবার সময় আজ আনুকে ডেকে আস্ত একটা সিকি দিয়ে গেছেন। সিকি! অন্যদিন হলে বাসার সবাইকে একবার করে না দেখিয়ে ছাড়ত না। আজ তার সেই যে মনটা ম্লান হয়ে গেছে সকাল বেলায় আর কিছু ভালো

লাগছে না। আজ সে সিকিটা পেয়ে চকোলেটের দোকান থেকে দুটো চকোলেট কিনে ফিরে এলো।

বাসায় এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চুষতে লাগল চকোলেট। ভাবল, তাকে অবহেলায় শুয়ে থাকতে দেখে সবাই এসে আদর করবে! কিন্তু কেউ তাকে তাকিয়েও দেখল না। তখন অভিমান হলো আরো। তার চোখের সামনে দেয়ালটা শাদা—বাঁশ ছেচে তার ওপর সিমেন্টের পলাস্তরা করে চুনকাম করে দিয়েছে। একেক জায়গায় ভেঙে বাঁশ বেরিয়ে পড়েছে। ভারী বিশ্রী লাগছে; আনু উঠে দাঁড়াল। পেন্সিল নিয়ে দেয়ালে, তার পড়ার টেবিলের ওপরে একটা হাঁস আঁকলো। তারপর পাশে বড় বড় করে লিখল আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ, মেস ম্যান হ্যাঁপি অ্যান্ড ওয়াইজ। লিখতে লিখতে ক্ষয়ে গেল পেন্সিলটা। তাতে কী? আনুর এখনো তিন আনা আছে, সে নতুন একটা পেন্সিল কিনে নেবে।

বড় আপা এ ঘরে এলেন। আনু বলল, একটা জিনিস খাবি আপা?

কিরে?

মুঠো করে চকোলেটটা তার হাতে গুঁজে দেয় আনু। কেমন লজ্জা করে। বড় আপার মুখটা হাসিতে রাঙা হয়ে ওঠে। নিয়ে চলে যেতে চান তিনি। আনু তার আঁচল ধরে টানে।

বাইরে গেলে ওরা সবাই দেখবে। আমার কাছে যে আর নেই।

আচ্ছা, আচ্ছা।

চৌকির কোনায় বসে বড় আপা মোড়কট খুলে মুখে পুরে দেন। চুষতে গিয়ে বুড়িদের মনে গাল বসে যায় তার। আনু হাসে। বড় আপা বলেন, খুব মিষ্টিরে! তুই খেয়েছিস?

ভাই বোনদের ভেতরে আনু সবচে ভালোবাসে বড় আপাকে। ওর মনে হয়, ওর মতো তাকে কেউ এত ভালোবাসে নি। আনু শুনেছে, ও যখন কোলে, তখনই বড় আপার স্কুলের লেখাপড়া শেষ হয়ে গেছে। তারপর কত জায়গা থেকে বিয়ে এসেছে বড় আপার, কিন্তু কোনটাই বাবার পছন্দ হয় নি। মনের মতো কাউকেই খুঁজে পাননি তিনি। আর যাদের পছন্দ হয়, তাদের সাথে বিয়ে দিতে অনেক টাকা লাগে। অত টাকা কোথায় পাবেন বাবা? তার বাবার যে টাকা নেই—-এই কথাটা আনু সেই ছোটবেলা থেকে উঠতে বসতে শুনে এসেছে। সেই ছোটবেলা থেকে টাকার প্রতি এক দুর্বোধ্য রহস্যবোধ শেকড় গেড়ে বসেছে আনুর মনে। আলীবাবার গল্পে যখন গুহার দরোজা খুলে যায় আর ঝলমল করে লক্ষ লক্ষ হীরে মণি মুক্তো চুণী পান্না, শুনতে শুনতে আনুর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যেত। তার মনে হতো, সে নিজেই যেন সেই গরিব কাঠুরে আলীবাবা। মনে হতো, সে যদি ও-রকম একটা গুহার সন্ধান পেয়ে যেত কোনদিন! তাহলে কী মজাটাই হতো। কার কাছে যেন শুনেছিল, অনেক সময় গাছের কোটরে বুড়ো বুড়ো বটগাছের শেকড়ের ফাঁকে গর্তের মধ্যেও মণি মুক্তো লুকোনো থাকে। কতদিন সে কত গাছের কোটরে উঁকি দিয়ে দেখেছে। একদিন হয়ত পেয়েই যাবে আনু। সেদিন মা আর মুখ কালো করে থাকবেন না, বাবার আর থানায় চাকরি। করতে হবে না, তাদের আর কোনো কষ্টই

থাকবে না। একরাতে আনু স্বপ্ন দেখেছিল উঠোন ভর্তি ছড়ানো রাশি রাশি নতুন টাকা, আর তার ওপরে মজা করে লাফাচ্ছে আনু, টাকাগুলো মুঠো ভরে তুলছে, ঢেলে ফেলছে, টুং টুং শব্দ উঠছে মিষ্টি বাজনার মতো।

আনু বুঝতেই পারে না বাবা মা কেন এত অস্থির হয়ে উঠেছেন বড় আপা মেজ আপা সেজ আপার বিয়ে দেবার জন্যে। সবার কাছে সে শোনে, ছোট দারোগার বউ বলে, পিন্টু বলে, কোর্ট দারোগার বুড়ি ফুপু বলে। এত বড় বড় সব মেয়ে। এদের ঘরে রাখে নাকি? ঘরে রাখলে মুখে কালি দেবে একদিন। আনু ভাবতে পারে না, মুখে কালি দেবে কী করে তার আপারা? তার বিশ্বাসই হয় না, না বলে না কয়ে তার বড় আপা কারো সাথে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে। গা শিরশির করে ওঠে আনুর। সেদিন ছোট দারোগাদের বাড়িতে তার ব্যাট বল গিয়ে পড়েছিল। সেইটে আনতে গেছে, তাকে ধরে ফেললেন ছোট দারোগার বৌ। আদর করে বসালেন। আনু উসখুস করছিল, তার খেলা দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বৌটাকে তার একেবারে পছন্দ না। মাকে সারাক্ষণ কী সব বলে আর মা-র মুখ আঁধার হয়ে যায়। আনুকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাস্টার সাহেবের কথা জিগ্যেস করলেন। তারপর হাতে একটা। কাউনের মিষ্টি মোয়া দিয়ে শুধোলেন, তার বড় আপার সঙ্গে মাস্টার সাহেব হেসে হেসে কথা। বলে কিনা, একলা ঘরে দেখা হয় নাকি, মাস্টার সাহেব সারাদিন বাড়ি ছেড়ে একদণ্ড বাইরে যায় না কেন? এই সব। আনু প্রত্যেকটা কথার বিরুদ্ধে সজোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে। তখন ছোট দারোগার বৌ তার গালে ঠোনা দিয়ে বলেন, আরে, সেদিন আমি দেখলাম মাস্টার তোর আপার হাত ধরে আছে। তুই না ভাই? তুই ধরতে পারিস না?

আনু অবাক হয়ে যায়। সত্যি দেখেছে নাকি বৌটা? সত্যি বড় আপার হাত ধরে ছিল মাস্টার সাহেব? আনুর চোখ ছলছল করে ওঠে। ফাঁদে পড়া পাখির মতো ছটফট করে সে। মাথা নেড়ে বলে, যাঃ। মাস্টার সাহেব কত ভালো।

সেইজন্যেই তো তোর বাবা নিজে খেতে পায় না, আবার বাড়িতে পর পুরুষ যোয়ান ছেলে এনে পুষছে।

তারপর তার হাতে আরো দুটো মায়া গুঁজে দিয়ে সাবধান করে দেন ছোট দারোগার বউ, খবরদার, কাউকে বলবি না, আমি কী বললাম। বুঝলি? তোর মাকেও না। আমি বাবা। তোদের সাতে-পাঁচে থাকতে চাই না। আমার মন পরিষ্কার। তাই পেটের কথা বলে ফেলি। আর বলব না বাবা, তওবা, তওবা। যাহ্।

এক দৌড়ে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে আনু। কিন্তু খেলায় আর মন বসে না। তার দেরি দেখে ছেলেরা খুব ক্ষেপে গেছে। তাদের হাতে বল-ব্যাট সব ছেড়ে দিয়ে সে চুপ করে পথের। ধারে কালভার্টের ওপর বসে থাকে। আজ হাটবার। হাটের দিকে তোক যাচ্ছে, বাকে করে আলু-পটল চালের বস্তা নিয়ে, কুমড়ো কাঁধে ঝুলিয়ে, মুরগিগুলো ঠ্যাং জড়ো করে বেঁধে। আবার সরষের তেল যাচ্ছে ভাড়ে করে। থানার কাছে অফিসার জলচৌকি পেতে বসেছে। সেখানে সব তেলওলা এসে ভঁড় রাখছে আর তাদের তেল খাঁটি কিনা পরখ করে দেখছে অফিসারটা। একেকজনের কাছ থেকে এক পো আধসের তেল আবার তুলে রাখছে আলাদা একটা টিনে। হাত জোড় করে মাফ চাইছে একজন।

আনুর মনে পড়ে যায়, পয়লা দিন দেখেই মেজ আপা না সেজ আপা বলেছিল বেশ্যার মতো। হোক খারাপ কথা, ঠিক বলেছে। ছোট দারোগার বউ তাছাড়া কি? কী বিচ্ছিরি কথা বলে আর পি পিচ্ করে হাসে। আবার রাতে একেকদিন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়। চেরা গলা, একটুও মিষ্টি লাগে না শুনতে, তার কত ঢং। একটা কথাই বারবার করে ঘুরে ফিরে গায়—-প্রিয়, মধুরাতে সাজিল মন। গানের আওয়াজ পেলেই বাবা কেমন অস্থির হয়ে ওঠেন। আনুকে বলেন, ঘুমো, ঘুমোসনি কেন?

আনু ভাবে, দূর ছাই, তারচে বিয়ে হয়ে যাক তার আপাদের। তাহলে খুব শিক্ষা হয় সবার। কেউ আর কিছু বলতে পারবে না তখন আনুকে। তখন আনু সবার সামনে বুক ফুলিয়ে যাবে। তখন কেউ কিছু বললে আর ছেড়ে দেবে না আনু। ইয়াসিনের কাছে চমৎকার কুস্তি সে শিখে নিয়েছে। তখন আর কেউ কিছু বলতেই সাহস পাবে না আনুকে।

কিন্তু বিয়ে দিতে গেলে যে অনেক টাকা লাগে। এত টাকা কোথায় পাবেন বাবা? চাচার কাছে গিয়েছিলেন, চাচাও ফিরিয়ে দিলেন খালি হাতে। ফিরে এসে বাবা কী রাগ করলেন মা–র ওপর! তারপর নিজেই বললেন, নাহ, তোমার আর দোষ কি?

সেদিন আপারা ভয়ে লজ্জায় কেউ আর বাবার সামনে আসেননি।

কদিন আগে মহিমপুর থেকেই দুটো বিয়ের কথা এলো বড় আপা মেজ আপার জন্যে। একজনের একটা সাইকেলের দোকান আছে। আনু ইস্টিশানের কাছে তার দোকানটা

দেখেছে, আর একজন টাউন ক্লাবের লাইব্রেরিয়ান, বাড়িতে নাকি বিস্তর ধানের জমি আছে। মেজ আপা আই. এ. পরীক্ষা দেবে প্রাইভেটে সামনের বছর, পড়াশোনার খুব শখ ওর। বিয়ের কথা শুনে কেঁদে সারা হলো। বড় আপার কিন্তু কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। আগের মতোই রানা নিয়ে ব্যস্ত, উঠোন ঝাড় দিচ্ছেন, বিছানা পাতছেন বিকেল বেলায়। যেন তার নয়, অন্য কারো বিয়ের কথা চলছে।

সাইকেলের দোকানটা দেখেছে আনু। ঝকঝকে দুটো নতুন সাইকেল রাখা, শো-কেসে পার্টস সাজানো আর সামনে মেরামতি হয়। লোকটা ভারী ফুলবাবু। ফিনফিনে জামা গায়ে সারাক্ষণ আশেপাশের দোকানে বসে আড্ডা মারছে। আবার ট্রেন এলে খামকা প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কী যেন খোঁজে, চারদিকে পাতিপাতি করে দেখে ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলিয়ে। আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোকানে গেলাশে চা খায়। আবার লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোকটি রোজ বিকেলে টাউনক্লাবের দরোজা খোলেন কোথা থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে। দারোয়ান ঘর ঝাড় দেয়। হ্যাঁজাকটা বার করেন তিনি। তেল ভরে দিলে নিজ হাতে জ্বালান। রেডিওটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান ধরেন! আনু মাঝে মাঝে রেডিওর গান শুনতে আসে এখানে। লোকটা যা কালো আর মোটা। মুটা সেই আন্দাজে কচি, একেবারে দশবারো বছরের ছেলের মতো! হাসি পায় দেখলে। এদের সঙ্গে বিয়ে হবে নাকি আপাদের? মা-র কিন্তু একটু পছন্দই হয়েছে।

সেদিন অনেক রাতে কি করে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আনুর। চারদিকে অন্ধকার থইথই করছে। প্রথমে ভয় পেয়ে আতকে উঠেছিল আনু, কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই ফিরে এসেছে সাহসটা। বাবার গলা শোনা যাচ্ছে। বাবার বিছানার পাশে

এসে বসেছেন মা। পান খাচ্ছেন বুঝি। কুটকুট করে সুপুরি ভাঙার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাবা মাকে বলছেন, না তা হয় না। ঐ অপদার্থ দুটোর সাথে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে পানিতে ফেলে দেওয়া ঢের ভালো। বুঝেছ?

মা আহত স্বরে বললেন, কত তুমি জামাই আনছো রোজ! এক পয়সা দাবি নাই, বাড়ির অবস্থা ভালো, আর কি চাও? এক সাথে দুই কাজ হতো, ঝামেলা কত কম।

বাবা সে সব কিছুই শুনলেন না। বললেন,তার চে মেয়েদের গলা টিপে মারবো। কী বংশ কী লেখাপড়া—-সবদিক থেকে দেখবে না তুমি?

বাবার এমন কঠিন কণ্ঠস্বর আনু কোনদিন শুনেছে বলে মনে পড়ল না। অন্ধকারে তার গাও ছমছম করে উঠল। পাত্র দুটো যে বাবার পছন্দ হয়নি, এত খুশি হয়েছে আনু—-কিন্তু সে খুশিটাও কেমন যেন ভয়ের মতো দলা পাকিয়ে শক্ত হয়ে রইলো তার বুকের ভেতরে। মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর এক সময়ে বললেন, এতগুলো টাকা ঢালতে পারবে না, কোন্ জজ ম্যাজিস্টার এসে তোমার জামাই হবে তুমিই জানো।

আহা, ওদের ভালো ঘরে বিয়ে দিতে হবে তো? তোমার বড় ছেলে সে তো লেখাপড়াই করলো না। অন্তত জামাই নিয়ে যদি দশজনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারো, তাও তো বংশের নাম থাকে।

বাবার কণ্ঠস্বর অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। একটু যেন বিষণও শোনাচ্ছে। যেন নিজেকেই কথাগুলো বলছেন বাবা। বললেন, টাকারই যুগ পড়েছে এখন। আমাদের ছোটবেলায় দেখতাম লোকে অমুক বাড়ির ছেলে বলে পরিচয় দিলে আর কিছু লাগত না। তা আমি কি আর ম্যাজিক জানি যে তুড়ি দিলেই টাকা আসবে? অধর্ম করবো না বলেই তো নইলে তুড়ি দিলেও টাকা আসে। একেকটা এমনও কেস আসে, সুযোগ তো কত হয়েছিল, পাঁচ দশ হাজার হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। নিলেই হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাব দেব কী? আল্লাহ্ যখন হাশরের মাঠে ডেকে জিগ্যেস করবেন—-গোলাম হোসেন, তোমাকে দিলাম জুলুম আর অন্যায় থেকে মানুষকে রক্ষা করতে, তুমি তারই গোলাম হয়ে গেলে? কী জবাব দেব তখন বলো? এও আল্লাহর এক পরীক্ষা আনুর মা।

মা হঠাৎ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে কেঁদে ফেললেন। তার কান্নাবিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তুমি তো আর বাসায় থাকো না। তুমি পেটেও ধরো নি। দিন রাত্তির পাড়াপড়শির কথা শুনতে কেমন লাগে তা তুমি বুঝবে কী করে?

শুনে আনুর মনটা হু-হুঁ করে উঠল। কান্না পেল। চলচ্ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল আপাদের চেহারা, ঘোট দারোগার বৌয়ের পিচপিচে হাসি, চাচার মুখ, সাইকেলের দোকান, টাউনক্লাবের রেডিওটা। টাকা তো দিতে চায় লোকে, কেন নিতে চায় না বাবা? কী হয় নিলে? বাবার ওপর ভীষণ আক্রোশ হতে থাকে তার। আল্লাহ্ যখন জিগ্যেস করবে তখন আল্লাহ্ কী বুঝবে না দরকার ছিল খুব তাই নিয়েছে বাবা। আল্লাহ্ সব জানে। তবু বাবা কেন জেদ করে থাকে? বাবা কি! ধর্ম আর অধর্ম কথা দুটো কতবার বাবার মুখে শুনেছে সে; ভালো করে প্রসঙ্গ বোঝেনি, অর্থ স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু এতটুকু

বুঝতে পেরেছে আনু, যে একটা শক্ত দড়িতে তারা অসহায়ের মতো বাঁধা পড়ে গেছে। বালিশে মুখ গুঁজে আনু ভাবে আমি যখন বড় হব, আমি কিছু মানবো না, কিছু শুনবো না।

ঘুম থেকে উঠে দেখে বেলা অনেক হয়ে গেছে। ফুল কুড়োবার জন্যে সালু আপা তাকে ডেকে ডেকে একাই চলে গেছে কখন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনু দেখতে পেল একে একে সবাইকে—-মা, বাবা, বড় আপা, মেজ আপা, সেজ আপা, মিনু আপা, ছোট আপা। তবু সবাইকে কেমন নতুন আর অচেনা মনে হলো আনুর। মনে হলো, কাউকে সে কোনদিনই চিনতো না। মনে হলো, যেন সবাই অন্য বাড়ি থেকে বেড়াতে এসেছে।

বাবা নেই, বাসাটা তাই বড় খালি খালি ঠেকছে। দুধ নেবে গো সেই কখন হেঁকে গেছে, আকাশে গড়িয়ে পড়েছে দুপুর, বড় বড় গাছের ছায়াগুলো ক্রমেই লম্বা হয়ে আসছে আর আনুদের বাসাটা যেন আরো একেলা হয়ে যাচ্ছে। বাসার কাছেই থানা বলে প্রায় দুপুরবেলাতেই বাবা আসতেন একটু চোখ বুজতে। কিন্তু আজ তো বাবা নেই। বাবা গেছেন মফস্বলে। মা আপারা শোবার ঘরে কেউ শুয়ে কেউ মেঝেয় বসে গল্প করছেন, উল বুনছেন।

আনু হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিল ইস্টিশানে। একা একা বসে ছিল গোডাউন শেডে পাটের বেলের ওপর। সেখানেও ভালো লাগল না তার। তখন আবার ফিরে এলো বাসায়।

বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই মাস্টার সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠে বসে বললেন, আনু, তোমাদের একটা চিঠি এসেছে এইমাত্র। ওই তো টেবিলের ওপর দ্যাখো।

আনু চিঠিখানা হাতে নিয়ে জিগ্যেস করে, কার চিঠি মাস্টার সাহেব?

কী জানি।

আনু তাকিয়ে দেখে খামের ওপরে লেখা ফ্রম পানু, ঢাকা।

পানু, পানু ভাই! ঢাকা থেকে লিখেছেন! একদৌড়ে চিঠিখানা নিয়ে আনু ভেতরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, মা, মা, বড় আপা, পানু ভাইয়ের চিঠি এসেছে।

বড় আপা তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলেন। আর সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে গোল হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার, তারপর হেসে ফেললেন। তখন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল বড় আপার নিঃশব্দ হাসিটা। বললেন, মা, ভাইয়া চাকরি পেয়েছেন।

চাকরি!

সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

হ্যাঁ, রেলের। অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন মাস্টার।

ধক করে উঠলো আনুর বুকের ভেতর। রেলের চাকরি! স্টেশন মাস্টার! আনু কি স্বপ্ন দেখছে। খপ করে সে চিঠিটা কেড়ে নিতে গেল, আমি আগে দেখি।

তুই কী দেখবি? ভাগ্।

সেজ আপা থাপ্পড় দিয়ে তার উদ্যত হাতটা ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু আজ রাগ করলো না আনু। বরং সে গোড়ালির ওপর খুশিতে এক পুরো চক্কর কেটে চেঁচিয়ে উঠল, হিপ হিপ হুররে।

সবাইকে চিঠিটা পড়ে শোনালেন বড় আপা। মাইনে ভালো। এবার ঈদের ছুটিতে বাড়ি আসবেন। কার কী চাই যেন আগে থেকেই লিস্টি করে পাঠিয়ে দেয়। মা বাবাকে সালাম আর সবাইকে স্নেহাশীষ। ছোট্ট এতটুকুন। তবু কী খুশি একেকজন। বারবার পড়েও যেন ফুরুচ্ছে না। মা তো দুবার পড়েও যেন কোনো অর্থ উদ্ধার করতেই পারলেন না, এত খুশি হয়েছেন তিনি। বারবার বলছেন,

আমি কিছু দেখতে পারছি নারে। পানুকে বলব এবার আমাকে একটা চশমা করে দেয় যেন। একবর্ণ পড়তে পারি না।

পড়বেন কী করে? আনু দেখেনি বুঝি? মার চোখে পানি এসে গিয়েছে।

সালু আপা বলল, আমি এক বাক্স ডি-এম-সি সুতো আর এক ডজন সোনামুখি সুঁই।

মেজ আপা বড় আপাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, তুই কী নিবিরে?

উত্তরে কিছুই বললেন না বড় আপা। শুধু ম্লান হাসলেন। আনুর এত খারাপ লাগে, বড় আপার একটুও শখ নেই। সারাদিন শুধু কাজ করবে, ছাই মাখাবে হাতে, মাথায় খড়ি পড়ে যাবে। যাকগে, তার কী? আনু নিজেই একটা চিঠি লিখবে। বলবে, আমার জন্যে একটা সত্যিকারের গার্ডের বাতি এনো পানু ভাই। আর তারপর হঠাৎ উদার হয়ে গেল মনটা। সে। আরো লিখে দেবে, বড় আপার জন্যে একটা খুব ভালো শাড়ি আনে যেন পানু ভাই।

ঘরে ঝোলানো একটা ছবি ছিল পানু ভাইর। মা সেদিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। তাকে একেবারে নতুন দেখালো তখন। তখন যেন মনে পড়ল সবার। তখন সবাই ছবিটার দিকে তাকাল।

বাবা মফস্বল থেকে ফিরে এসে চিঠিখানা পড়লেন। চিঠিখানা আনু এ কদিন নিজের হেফাজতে রেখেছিল বাবাকে দেবে বলে। পকেটে করে ক্লাশেও নিয়ে গেছে। মুন্সেফের ছেলে দেবুর সঙ্গে খুব ভাব। দেবুকে দেখিয়েছে চিঠিটা। আর বলেছে, পানু ভাই তার জন্যে। গার্ডের বাতি নিয়ে আসবে। দেবু তাকে এখন থেকেই চীনেবাদাম খাইয়ে রাখছে, বাতিটা এলে একদিনের জন্যে সে খেলতে নেবে।

পড়া শেষ করে বাবা বললেন, যাক, পানুর তবে একটা হিল্লে হলো এবার, কি বলিস? আনু, তুমিও লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে আরো বড় চাকরি করবে। অনেক মাইনের। কেমন?

শুনে বোকার মতো হাসতে থাকে আনু। বাবা মনে করেন আনুর বিশ্বাস হচ্ছে না। তাই তিনি আবার বললেন, হ্যাঁ তাই তো। মিছে কথা কি বলছি? আনু তখন ম-স্ত বড়লোক, কত টাকা। কত কী। ঢুকতে দারোয়ানের কাছে নাম লেখাতে হবে। বলতে হবে আমি সিভিল সার্জনের কাছে যাবো।

বাবার বড় শখ আনু সিভিল সার্জন হয়। আনুকে বাবা একটানে নিজের হাটুর ওপর তুলে বসিয়ে দেন। পা দোলাতে থাকেন। আনুর ভারী লজ্জা করে। সে কি ছোট এখনো? বড় আপাকে দেখে আরো লজ্জা করে তার। বড় আপা বলেন, বাবা তুমি হাতমুখ ধোবে না? নামাজের বেলা যায়।

ওরে তাই তো। নাম তো বাবা। যাঃ।

আনুর পাছায় চটাস্ করে একটা মিষ্টি থাপড় লাগিয়ে দেন বাবা। তারপর কাপড় ছেড়ে ওজু করতে বসেন। মফস্বল থেকে পাকা পেপে এনেছেন বাবা। সেইগুলো কাটা হচ্ছে রান্নাঘরে। আনু একদৌড়ে সেখানে গিয়ে উবু হয়ে বসে। যেন একাই সে আজ সবগুলো খেয়ে ফেলবে।

৬. ট্রেনটা হুস-হুস ঝকঝক করতে করতে

ট্রেনটা হুস-হুস ঝকঝক করতে করতে অবশেষে স্টেশনে থামলো। মাঝখানে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পারে। ডাউন দেয়নি। সিগন্যালটা থানার একেবারে কাছে। আগে জানলে, ইস আনু গিয়ে ওখানেই দাঁড়াত। কে আসত এতদূর কষ্ট করে স্টেশন পর্যন্ত বয়ে।

ট্রেন দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে লোকে থইথই হয়ে গেল প্ল্যাটফরম। আনু কাছে যেতে পারছে না, কিছু দেখতে পারছে না। বাবা তাকে স্টেশনে পাঠিয়েছেন পানু ভাইকে আনবার জন্যে। সঙ্গে ইয়াসিন আছে। ইয়াসিন বলল, খোকাবাবু ইরকম কি দেখতে পাবেন? আপনাকে হামার কাঁধে লিয়ে লি।

ইয়াসিন নিচু হয়ে কাঁধ পেতে দিল তার। একলাফে আনু সওয়ার হলো তার ওপর। যাঃ ভারী খারাপ দেখাচ্ছে। আগে ভাবেনি, কাঁধে উঠে খারাপ লাগছে খুব। হাসি পাচ্ছে। ক্লাশের কেউ দেখে ফেললে যা খেপাবে। আরে ঐতো।

পানু ভাই হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছেন, আনু আনু।

সেকেণ্ড ক্লাশে এসেছেন পানু ভাই। রেলেব লোক তো। চাট্টিখানি কথা নয়। আনু খুশির তোড়ে পা ছুঁড়তে থাকে। ইয়াসিন ঊর্ধ্বমুখ হয়ে শুধোয়, ভাইয়া?

আরে আমাকে নামাও না।

একদৌড়ে আনু ভিড় ঠেলে পানু ভাইর কাছে গিয়ে হাজির হয়। তিনি তার হাত দু হাতে ধরে ফেলেন।

এসেছিস?

ইয়াসিন এসে লম্বা সালাম ঠেকে। দাঁত বার করে জানায়, হামি ইয়াসিন সেপাহি, বড় খোকাবাবু। আপনার সামনে কী আছে?

পানু ভাই আনুকে জিগ্যেস করেন, বাসা কদুর রে?

আনন্দে এতক্ষণ একটা কথা বলতে পারে আনু। এবারে সে মহা উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, এই তো, এখানে। গোড়াগাড়ি নেবে? টমটম আট আনা নেবে। হ্যাঁ চলো টমটমে যাই।

টমটম ওঠার ভারী শখ ছিল আনুব। প্রথম যেদিন এসেছিল ওরা মহিমপুর, হেঁটেই গিয়েছিল বাসায়। সারা মহিমপুরে টমটম মাত্র তিনটে। তাও আগে থেকে ভাড়া হয়ে থাকে; দূরের গায়ে ভাড়া করে প্যাসেঞ্জারেরা নিয়ে যায়। আজ আনু দেখে এসেছে, দুটো টমটম দাঁড়ানো।

টকাটক টকাটক শব্দ তুলে টমটম চলতে লাগল লাল সুরবির রাস্তা দিয়ে। কোচোয়ান আবার পথ থেকে লোক সরাবার জন্যে হাতের ছড়িটা ঘুরন্ত চাকায় ছোঁয়াচ্ছে, শব্দ উঠছে কররররঠক। অবাক হয়ে আন দেখছে পানু ভাইকে।

কতকাল সে দেখেনি। মনেই পড়ে না শেষ কবে দেখেছে। শোর যখন তাকে দেখেছিল আনু, তখন কী রোগা আর ফ্যাকাশে ছিলেন পানু ভাই। চুলগুলো ছিল বাঁয়ে সিথি করা, বালিশের নিচে রেখে ইস্ত্রি করা জামা পরতেন তখন। এখন একেবারে অন্য মানুষের মতো মনে হচ্ছে সেই পানু ভাইকে। ধরতে গেলে যেন চেনাই যায় না। মাথার চুল পেছন দিকে উটিয়ে সিঁথি করেছেন, ধোবাবাড়ির ধোয়া শার্ট পরেছেন, গা থেকে আবছা একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। ট্রেনে আসবার ক্লান্তি এতটুকু লেখা নেই কোথাও। সেকেণ্ড ক্লাশ তো বাড়ির মতো। শুয়ে বসে যেমন খুশি আসো। ভিড় নেই, কী মজা! আনু এবার পানু ভাইকে বলে সেকেণ্ড ক্লাশে চাপরে, রাজশাহী–টাজশাহী যাবে। আবার সিগারেট খেতে শিখেছেন পানু ভাই। গুনগুন করে গান গাইছেন।

হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে গেল। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল আনু। পানু ভাই গান থামিয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন, কিরে? লেখাপড়া করছিস, না, খালি টো-টো?

ধেৎ। আমাকে ফোরে নিতেই চায় না, হেডমাস্টার আমাকে নিজে পরীক্ষা করে তবে ফোরে নিয়েছে।

তাই নাকি?

কেমন অদ্ভুত একরকম চোখ করে পানু ভাই কথা বলেন, যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন, তার চোখটা সেইসব স্বপ্নের ছবি দেখে ফিকফিক করে হাসছে। আনু প্রতিবাদ করে ওঠে, বাবাকে জিগ্যেস কোরো না তুমি? এখানে সব নতুন বই। তাই আমি বলে সব পড়ে ফেলেছি।

বাহ। আর চাই কী?

পানু ভাই আবার গুনগুন করেন খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ শুধোন, হারে, বাবা আমার চাকরির কথা শুনে কী বলল?

কী খুশি সকলে। বাবা মিলাদ পড়ালো সেদিন। আমি ইস্টিশনের দোকান থেকে জিলিপি কিনে এনেছিলাম তিন সের।

হাঃ হাঃ হাঃ।

গলা খুলে হাসতে থাকেন পানু ভাই। তার হাসির শব্দ চাকার শব্দ একাকার হয়ে এক তালে বাজতে থাকে। আনু ভেবেই পায় না এতে হাসবার কি আছে? কিন্তু সেও হেসে ওঠে। বলে, কত লোক হয়েছিল।

চারদিকে দেখতে থাকেন পানু ভাই তার হাসি-হাসি চঞ্চল চোখ মেলে।

মহিমপুর তো বেশ শহর।

আবার নদী আছে পানু ভাই। নদীর পাড় থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাবো।

কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার নামে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না পানু ভাইর। বরং তিনি আনুকে অবাক করে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, মাছ কেমন নদীতে? জানিস?

আনু হঠাৎ প্রসঙ্গটা বুঝতে পারে না। তার মনে পড়ে যায়, তাড়াতাড়িতে খেয়াল করেনি, পানু ভাই যখন বাক্স নামিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনটে বড় বড় হুইল লাগানো ছিপ দেখেছিল। ছিপগুলো ইয়াসিনের হাতে দিয়ে পানু ভাই বলেছিলেন, হুঁশিয়ারি সে লে জানা। বহুৎ নাজুক হয়।

মুঝে মালুম হ্যায় বড়া খোকাবাবু।

আনু বিস্মিত গলায় বলে টমটমের দুলুনিতে দুলতে দুলতে, তুমি ছিপ দিয়ে মাছ ধরো?

দূর বোকা! ছিপ দিয়ে মাছ ধরবো না তো কি বাঘ মারবো?

তা পানু ভাই যদি বলতেন যে ছিপ দিয়ে বাঘও তিনি মারেন তাহলেও অবিশ্বাস করতো না আনু। কারণ, তার ভাই জগতের সবচে অসম্ভব অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর কাজ করেন—রেলের স্টেশন মাস্টার তিনি। কেমন অজানা এক রহস্যের ঘ্রাণ তার চারপাশে। আনু যেন একেবারে সম্মোহিত হয়ে যায়। তার বিশ্বাসই হয় না, এই লোকটা, এই পানু ভাই, তার বড় ভাই।

টমটমওলা ঘাড় বাঁকিয়ে জিগ্যেস করে, কোনটে খাড়া করিম? বাসার গেটৎ?

বাসার সামনে এসে গেছে টমটম। আনু আধো উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্কেবারে গেটে লাগাও।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে আপারা সব ছুটে এসেছেন দরোজায়। তাদের একপাশে মা মাথায় ঘোমটা তুলে দিতে দিতে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা তার থিরথির করে কাঁপছে, যেন পানিতে ছায়া পড়েছে। আনু লাফ দিয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল সবাই। সে গুঞ্জনের কোনো অর্থ নেই, একটা সুরের মতো।

পানু ভাই সবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। খামোকা মাথার চুলে হাত ঘষলেন, তারপর বড় আপা মেজ আপাকে জিগ্যেস করলেন, কেমন আছিস?

কাছে আসতেই, আনু দেখে, মা-র চোখে পানি। সে পানি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে। মুছবার চেষ্টা করছেন না। পানু ভাই কাছে আসতেই তার গায়ে হাত রেখে মা এবার

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আনুর বড় অদ্ভুত লাগলো। আপারা সবাই হাসছেন, তাদের হাসি হাসি মুখগুলো ছবির মতো জ্বলজ্বল করছে, পানু ভাইকে লজ্জিত বিব্রত দেখাচ্ছে, মা কাঁদছেন অথচ তার মুখেও হাসি। আনু একেবারে অবাক হয়ে গেল।

হঠাৎ পানু ভাই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আনুকে জিগ্যেস করলেন, ভাড়া কতরে?

আট আনা।

টমটমওলা একগাল হেসে বলল, না মুই আট আনা নিবার নই। এক টাকা দেন তোমরা।

আনু ধমকে ওঠে, কিসের এক টাকা?

কেনে? হামার খুশি নাগে না? বড় খোকা বাড়িতে আইচ্চেন, হামাকে তোমরা এক টাকা দিবেন না কেনে?

পানু ভাই তাকে আস্ত একটা টাকাই দিয়ে দিলেন।

বাবা উঠোনে একটা মোড়ায় বসে মুরগির বাচ্চাগুলোকে খুদ দিচ্ছিলেন। চোখ তুলে তিনি বললেন, এলি?

পানু ভাই তাঁর কাছে এসে কদমবুসি করল। বাবা তখন আরো মুঠো মুঠো খুদ দিলেন ছড়িয়ে দিয়ে হাতটা একেবারে খালি করে ফেললেন। তারপর হঠাৎ গরম হয়ে বললেন, এদ্দিন গেল একটা চিঠি নাই পত্র নাই, এই তোমার আক্কেল, আঁ? এখানে কেউ তোমার কিছু না? চাকরি পেয়ে চিঠি দিলে, আর আমি উদ্ধার হয়ে গেলাম? এই স্বাস্থ্য হয়েছে? আনু বুঝতে পারে, বাবা একটুও রাগ করেননি, যদিও গম্ভীর গলায় কথা বলছিলেন। পান ভাই দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছিলেন, আমতা আমতা করছিলেন, হাসি পাচ্ছিল আনুর। তার এখন কত কাজ। পানু ভাইর সুটকেশ দুটো নতুন আর কী বড়। আনু যতক্ষণ না সেই সুটকেশ দুটো খুলতে পারছে, ভেতরটা ছটফট করছে। পানু ভাইর হাত ধরে সে টান দেয়। বলে, ঘরে এসো না মা ডাকছে।

বাবা আবার মুরগির বাচ্চাগুলোকে টি–টি আয় আয় বলে ডাকতে থাকেন।

সুটকেশে চাবি লাগাতেই আনু জিগ্যেস করে উঠল, আমার গার্ডের বাতি পানু ভাই?

ডালাটা লাফিয়ে উঠল সুটকেশের। পানু ভাই মুখ তুলে বললেন, দূর পাগল। গার্ডের বাতি দিয়ে তুই কী করবি?

বারে, তোমাকে বললাম যে!

চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছেন আপারা। সেজ আপা বলেন, আনুর যে কী কথা। জানো পানু ভাই, আনু না গার্ড হবে। আপাকে বলেছে।

যাহ্। আমি মারবো কিন্তু?

মেজ আপা ধমকে ওঠেন, ছিঃ আনু।

পানু ভাই তখন বলেন, গার্ডের বাতি পাবি কোথায়? তুই যখন গার্ড হবি, তখন রেল থেকে দেবে। তোর জন্যে অন্য একটা জিনিস এনেছি।

সঙ্গে সঙ্গে আনুর নাকের ভেতরে সুটকেশের খোলা ডালা থেকে উঠে এসে চামড়া আর ন্যাপথলিনের পাকানো ঝাঝালো ঘ্রাণ লাগে। মাথার ভেতরটা রিমঝিম করতে থাকে। বুকটা ঢিপঢিপ করে ওঠে। পানু ভাই একেবারে তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা চৌকো বাক্স বার করে আনেন। আনুর সামনে তুলে ধরে বলেন, বলত কি?

আনু প্রায় লাফিয়ে কেড়ে নেয় বাকসটা। চেঁচিয়ে ওঠে, আমার আমার বলে। আপারা তাকে ছেকে ধরেন, দেখি দেখি করে। আনু একটানে বাক্সটা খুলে দেখে ছোট্ট একটা টেবিল ঘড়ি। ঘড়ির ওপরে একটা প্যাচার ছবি। সেকেণ্ডের কাটা টিকটিক করছে, তালে তালে প্যাঁচার চোখ দুটো একবার ডানে একবার বামে তাকাচ্ছে। আনু ঘড়িটা মাথার ওপর তুলে বাঃ কী মজার বলে নাচতে লাগল এক পায়ে। খিলখিল করে হেসে উঠল সালু আপা মিনু আপা।

পানু ভাই জিগ্যেস করলেন, কি পছন্দ? আবার অ্যালার্ম আছে। দেখিস, কী সুন্দর বাজে। আনু ঘড়িটা নিয়ে একদৌড়ে বাবার কাছে চলে যায়। বাবা ঘড়িটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। দেখেন উজ্জ্বল চোখে। প্যাঁচাটার কাণ্ড দেখে হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, মানুষের কী বুদ্ধি দ্যাখ, আনু।

একেবারে সত্যির প্যাঁচা যেন, না বাবা?

বাবা যেন কত হালকা হয়ে গেছেন, বয়স তাঁর কমে গেছে এক মুহূর্তে। ঝরঝরে গলায় তিনি বলতে থাকেন, কত দাম হবে? পানুটা চিরকাল খরুচে। তোর জন্যে এনেছে, এবার থেকে ঘড়ি ধরে পড়তে হবে। অ্যালার্ম দিয়ে রাখবি, টুনটুন করে বাজবে ভোর পাঁচটায়, ঘুম থেকে উঠবি তখন।

আরে, প্যাঁচাটা সত্যি ভারী সুন্দর এঁকেছে তো!

বাবার হাত থেকে ঘড়িটা কেড়ে নিয়ে মা-কে দেখাতে যায় আনু। মা রান্নাঘরে। গিয়ে দেখে বড় আপা পরোটা বেলছেন আর মা খুন্তি দিয়ে মোহনভোগ নাড়ছেন। ভারী মিষ্টি একটা ঘ্রাণ উঠেছে। জিভেয় পানি এসে যাচ্ছে। আনু ঘড়িটা মেঝের ওপর বসিয়ে বলে, বড় আপা, দ্যাখ।

আরে, এটা কী?

বড় আপা বেলন থামিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

তোকে দিল পানু ভাই?

হ্যাঁ, আমাকে। আর কাউকে না।

তখন পানু ভাইর গলা শোনা গেল বাইরে, ডাকছেন, তুই কোথায় গেলি ফতেমা? ফতেমা। বড় আপা মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি আবার পরোটা বেলতে লাগলেন। মা বললেন, যা না, ডাকে তোকে।

বড় আপা মাথা আরো নামিয়ে নেন। ডাকতে ডাকতে পানু ভাই এসে হাজির হন রান্নাঘরের দরজায়। বলেন, তুই এখানে? দ্যাখ তো পছন্দ কিনা।

বলে একটা নীল ঝলমলে শাড়ি বড় আপার কোলে ছুঁড়ে দিলেন পানু ভাই।

ওর সঙ্গে ব্লাউজ পিসও আছে। বাব্বাঃ, আমি কি মেয়েদের জিনিস কিছু বুঝি না পছন্দ করতে পারি? আর যেমন কপাল, সবগুলোই মেয়ে এ বাড়িতে। কিরে, কেমন?

আনু, ওকে একটা টুল দে।

মার কথায় চৈতন্য হয় আনুর। সে একটা টুল এনে মুছে দেয় বসবার জন্যে। পানু ভাই বসেন। তাকিয়ে থাকেন বড় আপার দিকে। বড় আপা তেমনি মুখ নিচু করে আড়-চোখে কাপড়টা একবার দেখে। নীল জমিন, পূর্ণিমা রাতের আকাশের মতো জ্বলজ্বল করছে। চওড়া রূপোলি জরির কাজ করা পাড়। আনুর খুব ভালো লাগে। বড় আপা কোনোদিন একটা ভালো কাপড় পরেন না। গলে; কাপড় পরলে ওকে কী সুন্দর লাগে, দেখতে! সেদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল মা–র পুরনো সবুজ শাড়িটা পরে, একেবারে জমিদার বাড়ির মেয়ের মতো লাগছিল বড় আপাকে। ম ঝংকার দিয়ে ওঠেন, এ কেমন মেয়ে? ভাই একটা জিনিস দিলে মানুষ কত খুশি হয়, বলে, আর একটা কী হয়েছে? মনিষ্যির জাত না?

পানু ভাই বলেন, না, ও যা লাজুক। চিঠি দেখেই বুঝেছি। সবার জন্যে সব লিস্টিতে আছে, ফতেমার কোন নামই নেই।

বলতে বলতে পানু ভাই কোলের কাছ থেকে দুটো মোড়ক তুলে ধরেন। আনু উদগ্রীব হয়ে ওঠে, আরে, এটা আবার কি?

মোড়ক খুলাতে দেখা গেল, একটা রূপোর পানের বাটা আর এক জোড়া নরম কালো কুচকুচে চাট। মা–র সামনে রেখে পানু ভাই বললেন, মা, তোমার জন্যে।

কড়াইটা উনোন থেকে নামিয়ে মা জিনিস দুটো হাতে নিয়ে কী খুশি হয়ে ওঠেন। গগনে আগুনে ঘাম ছুটতে থাকে তার। হাসিতে আলো হয়ে ওঠে মুখটা। বলেন, তুই আবার আমার জন্যে খরচ করতে গেলি কেন?

খরচ আর কি?

মা অনেকক্ষণ ধরে নেড়ে চেড়ে দেখলো! পানের বাটাটা খুলে ছোট ছোট বাটিগুলো তুলে দেখলেন আর হাসলেন। তারপর পানু ভাইর দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন থেকে মাসে মাসে টাকা জমাস পানু। পাঁচ টাকা দশ টাকা করে জমালেই বছরান্তে কত টাকা হয়। আনু, যাতো জিনিসগুলো ঘরে রেখে আয়।

মার জিনিস, বড় আপার শাড়ি, নিজের ঘড়ি নিয়ে আনু এ ঘরে এসে দেখে এক মহা হুলস্থুল কাণ্ড—-ছড়ানো জিনিসপত্র, শাড়ি, ক্রুশকাটা, উল, ডিএমসি সুতো, স্নো, পাউডার, ফিতে, সাবান নিয়ে আপার বিছানা জুড়ে বসেছেন। এ ওর জিনিস মিলিয়ে দেখছে, গালে ঠোনা দিচ্ছেন, হেসে উঠছেন, কাপড়গুলো বুকে লাগিয়ে লাগিয়ে পরখ করছেন। বাবার জন্যে কার্পেটের জায়নামাজ আর পাঞ্জাবির কাপড় এনেছেন পানু ভাই। জায়নামাজটা জলচৌকির ওপর এরি মধ্যে কে বিছিয়ে দিয়েছে। ঘরটা একেবারে নতুন লাগছে। আনুর টেবিল ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা বাজে।

বাবা তাকে ডেকে নিলেন।

চলতো, বাজার থেকে আসি। থলেটা নিয়ে আয়।

বাবা বাসার সামনে খুব আস্তে আস্তে পায়চারি করছেন আর কথা বলছেন বড় জমাদার সাহেবের সঙ্গে।

বাজারে গিয়ে দেখে সবে বাজার বসেছে। বড় বড় মাছ ধপাস ধপাস করে এনে ফেলছে শান বাঁধানো চত্বরের ওপর। ওপাশে বুড়ো বেহারি খাসির রানগুলো ঝুলিয়ে রাখছে। বাজারের পেছনে মজা পুকুরটা কচুরি পানায় সবুজ হয়ে আছে।

কিরে, মাছ নিবি না মাংস?

আনু কিছু বলে না। সে কী বলবে? বাবা তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই মাছগুলার কাছে এগুলেন। বললেন, বীরেন, আজ একটা রুইয়ের মাথা দিতে হয়।

মাঝি হেসে বলে, কর্তা, আইজ কেনে তোমরা আইচ্চেন। মোক্ খবর দিলে, মুই দিয়া আনু হয়।

আচ্ছা, হয়েছে। বড় ছেলে বাড়ি এসেছে মাঝি। ভালো দেখে দিও। কেমন?

ঝপাং করে আনুর থলেতে আস্ত একটা প্রকাণ্ড রুইয়ের মাথা তুলে দেয় মাঝি। কাকো কি লাল! ফুলের মতো। টপটপ করে রক্ত পড়ছে। কিছুতেই দাম নেবে না সে। বাবা

জোর করে দুটো টাকা গুঁজে দিলেন তার হাতে। তারপর ভালো শিলআলু নিলেন দুসের। নতুন টম্যাটো উঠেছে।

কত করে হে?

পাঁচসিকা সের।

পাঁচসিকে! —-আচ্ছা দাও, আধসের।

বাইরে বেরিয়ে আনুকে বললেন, ভাল লাগছে খুব?

নাহ্।

আনু একহাতে থলেটা ধরে জোরে জোরে হাঁটতে থাকে বাসার দিকে। ওজন ছিল সত্যি। কিন্তু ওজনটাকে কিছুই মনে হয় না তার। কদিন পরে রুইয়ের মুড়ো কিনলেন বাবা। স্বাদটা ভুলেই গিয়েছিল আনু। এত ভালো লাগে তার। রাতে কখন খেতে বসবে সেই ছবিটা আনুর জিভে সরস করে তোলে।

বাসায় এসে দেখে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে পানু ভাই হাত নেড়ে নেড়ে গল্প বলছেন আর সিগারেট খাচ্ছেন। আপারা ঘন হয়ে বসেছে। মা বসে বসে সরু চাল বাছছেন। থলেটা বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে আনু বলল, পানু ভাই! মার সামনে তুমি সিগারেট খাও?

হা-হা করে হেসে উঠলেন পানু ভাই। আপারা গড়িয়ে পড়ল এ ওর গায়ে। পানু ভাই তার পাছায় একটা চাপড় মেরে বললেন, মার সামনে খেলে কিছু হয় না। মা তো মা।

আনুও তখন হাসতে হাসতে তার হাঁটু ঘেঁষে বসলো। সে এখন ইস্টিশানের গল্প শুনবে। সবাইকে সে থামিয়ে দিয়ে পানু ভাইর হাত ধরে জিগ্যেস করে, তুমি ফোনে কথা বলো, না পানু ভাই? আর ঘটাং–ঘটাং করলে একটা বল বেরিয়ে আসে না?

.

নদী এইখানে বাঁক নিয়েছে। পানু ভাই মাঝিকে বললেন নৌকা বাঁধতে। ছিপগুলো ধরে ছিল আনু, সেগুলো নিলেন তিনি। বললেন, নেমে আয়। সাবধানে নামবি।

লাফ দিয়ে নৌকো থেকে নামলো তাবা। তারপর ফাঁকা ঝাউবনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। মহিমপুর থেকে কতদূর চলে এসেছে তারা। পানু ভাই মাছ ধরবে। মাথার ওপরে বেলা দুপুরের রোদ গনগন করছে। ধুধু নদী চর, প্রান্তর, পানি দেখাচ্ছে বিশাল একটা ছবির মতো। আবার পানিটা আয়নার মতো জ্বলছে, চোখ রাখা যায় না।

পানু ভাই চলছেন আগে আগে। তার কাঁধে ছিপ তিনটে। আর পেছনে আনু। তার হাতে ঝোলানো দুটো বার্লির কৌটা। ওর মধ্যে আধার আছে। আজ সারা সকাল ধরে মেথি হিং দিয়ে, বোলতার চাক ভেঙে, চাল ভেজে বানিয়েছেন পানু ভাই। মার কি বকা! পানুভাই

শুনে হাসেন। মা খালি বলছিলেন, তুই কোথা থেকে শিখলি এসব? ভদ্দরলোকের ছেলেরা ধরে? যতো সব আলসে, অকম্মার বদনেশা। পানু ভাই একটুও প্রতিবাদ করেন নি। একমনে তিনি আধার বানিয়ে চলেছেন। বার আনুকে দিয়ে বাজার থেকে এক আনার পোনামাছ আনিয়েছিলেন, একটা কৌটোয় পানি দিয়ে পোনাগুলো তাজা করে রেখেছেন। আনু অবাক হয়ে গিয়েছিল, এই ছোট মাছগুলোকে বা মাছ খেতে আসে। মাছ, মাছ খায। কী অবাক কাণ্ড! আনুর খুব আসতে ইচ্ছে করছিল, মাছ ধরা দেখবে সে। কিন্তু বলতে সাহস হয়নি। পানু ভাই যেন মনের কথা পড়তে পারেন। আধার বানাতে বানাতে তিনি বলছিলেন, আজ তো তোর ছুটি, চল তুই আমার সঙ্গে।

ঈদের জন্যে বন্ধ দিয়েছে স্কুল।

ঝাউবনের ভেতর দিয়ে চারদিকে সন্ধানী চোখ ফেলে ফেলে হাঁটেন পানু ভাই। তারপর একটা জায়গা এসে বলে, খুব চিন্তিত আঃ আনমনা গলায়, এ জায়গাটা মন্দ না।

বলেই তিনি খাড়া পাড় বেয়ে নামতে থাকেন তরতর করে। আনুর খুব কষ্ট হয় নামতে। দুএকবার সে পড়ে যায়, গায়ে বালি লাগে, কিন্তু পানু ভাই ফিরেও তাকান না। একেবারে পানির কাছে এসে তিনি বলেন, বুঝলি, এইসব জায়গায় মাছ থাকে। নদী বাঁক নিয়েছে কিনা, পানির খুব তোড়, তাই মাছগুলো এদিকে এসে সব জড়ো হয়ে থাকে।

আনু হাঁ হয়ে যায় শুনে। এইসব কাণ্ড নাকি? একটা জায়গা বেছে নিয়ে পানু ভাই ছিপ ফেলে বসেন। তিন তিনটে ছিপ। আনু চোয়াল ঝুলিয়ে তাঁর কাণ্ডগুলো দেখে। অবাক

হয়ে তাকিয়ে থাকে ভেসে থাকা যাত্রা তিনটের দিকে। পানু ভাই তাকে একটা ফানার দিকে নজর রাখতে বলেন, তাতে সে বড় খুশি হয়ে যায়। একমুহূর্ত চোখ এদিক ওদিক সরায় না। একটা স্বপ্নের মতো লাগে আনুর।

এই বেলা তিনটের রোদ, ঝিকমিক করতে থাকা নদী, আকাশে কালো বিন্দুর মতো একটা দুটো পাখি, স্রোতের মুখে ভেসে চলা বড় বড় নৌকার মন্থর চলে যাওয়া, পাশে নিবিষ্ট মনে বসে থাকা পানু ভাই, পাড়ে ঝাউবনে বাতাসের সরসর আর কোথা থেকে উঠে আসা নিবিষ্ট সব শব্দ–বাতাসে মানুষের বহুদূর থেকে ভেসে আসকণ্ঠ, নদীর ছলছল সব মিলিয়ে এক অপরূপ মায়ার সৃষ্টি হয় আনুর মনে। সে যেন এখানে নেই, কোথাও নেই, পৃথিবী ছাড়িয়ে এক রহস্যময় জগতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা, মা, আপারা, ইয়াসিন সেপাই, সুরেন স্যার, ড্রয়িং স্যার, মহিমপুর ইস্টিশান, পোস্টাফিসে চিঠি আনতে যাওয়া সব কতদূর ফেলে এসেছে আনু। সেখানে আর ফিরে যাবার কথা মনেও হচ্ছে না তার। মনে হচ্ছে, এখানে এইভাবে সে পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত বসে থাকবে পানু ভাইর পাশে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান পানু ভাই। চমক ভাংগে আনুর। তাকিয়ে দেখে, তিনি একহাতে ছিপটা ধরে আছেন শক্ত করে, সরসর করে হুইল থেকে সুতো খুলে, নদীর অতলে চলে যাচ্ছে। আনুও উঠে দাঁড়ায়। চঞ্চল হয়ে একবার পানু ভাইর দিকে একবার নদীর দিকে তাকায়। দ্রুত কণ্ঠে জিগ্যেস করে, কি? মাছ?

কোন জবাব দেন না পানু ভাই। তার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছেন তিনি। মাথার ফিনফিনে চুলগুলো বাতাসে ঝিরঝির করে

উড়ছে। সুতো নাড়া বন্ধ করে আস্তে আস্তে বায়ে কয়েক পা হেঁটে গেলেন পানু ভাই চোখ তাঁর নদীর পানিতে। আনু কিছু বুঝতেই পারে না, কি ব্যাপার। তার ভারী গর্ব হয। মুগ্ধ চোখে পানু ভাইকে সে দেখতে থাকে।

আস্তে আস্তে সুতো গুটোতে থাকেন পানু ভাই। তারপর একসময় থেমে যান। নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকেন। পানিতেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। হঠাৎ আবার টান পড়ে সুতোয়, সরসর করে খুলে যেতে থাকে, ট্রিং ট্রিং শব্দ করতে থাকে হুইল, পানু ভাই বলেন, জোর গোত্তা মারছে রে। সের পাঁচেক হবে।

কী?

মাছটা।

সুতোর টানেই ওজন বুঝতে পারেন পানু ভাই? অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক স্বপ্নরাজ্যের মানুষ মনে হয় তাঁকে আনুর। মিনিট দশেক এরকম খেলা চলে পানির অতলে মাছটার সঙ্গে ডাঙায় দাঁড়ানো পানু ভাইয়ের। একসময়ে হঠাৎ এক ঝটকায় ছিপটা তুলে ফেললেন তিনি। গোড়ালির ওপর ঘুরে একেবারে উলটে মুখ হয়ে যান। শূন্যে ধনুকের মতো লেজ বানাতে থাকে। আনু দৌড়ে যায় ধরবার জন্যে।

রিঠা মাছ! কেমন নীলচে ধূসর রং, আবার গোঁফ আছে দ্যাখো{ বশীটা গিয়ে গেঁথেছে নিচের ঠোঁটে একেবারে এ ফেঁড় ও ফোড় হয়ে। আনু সন্তর্পনে হাত রাখে মাছটার গায়ে।

কী ঠাণ্ডা, একেবারে বরফের মতো। মাথার ওপরে খসখসে, পাখনা নড়ছে এখনো, মসৃণ। আনুর খুব ইচ্ছে হয়, সে যদি এরকম মাছ ধরতে পারতো, অবাক হয়ে যেত সবাই। পানু ভাইকে বলে, বাবা রিঠামাছ যা ভালবাসে।

তাই নাকি রে?

দেখো তুমি।

পানু ভাই পকেট থেকে ছুরি বের করে মাছের পেটটা চিরে ফেলেন। বের করে দেন আতুরিটা। তারপর খালুইয়ের ভেতরে রেখে দিয়ে আবার ছিপ নিয়ে বসেন। আনু জিগ্যেস করে, কেন?

তাহলে আর পচবে না। এসব মাছ আবার তাড়াতাড়ি নরোম হয়ে যায়, বুঝলি? কিরে তোর ছিপে এখনো কিছু পড়ল না যে!

ছোট ছিপটা আনুকে দেখতে দিয়েছিলেন। তার ফান্য এখনো স্থির। একটু একটু দুলছে কেবল স্রোতের দোলায়। পানু ভাইর ফানাটা আবার ঝাঁকুনি দিয়ে তলিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ফেরবার পথে পানু ভাই চা খাবার জন্যে বসেছিলেন ইস্টিশানের দোকানে।

ওহে, আমাকে একটা কড়া চা দিও! আর একে মিষ্টি, কি আছে?

অমিরতি দেই?

দাও, দুটো দিও। কিরে দুটো খেতে পারবি না আনু?

দোকানে যারা বসেছিল তারা শুধালো মাছের কথা। কেউ কেউ বলল, বাহু, ছিপে আপনার গুণ আছে যাহোক! বাজারে সাত আট টাকার মাছ হবে। তাও তাজা পাবেন কোথায়?

আপশোষ করতে কবতে তারা মাছগুলো দেখল আঙুল দিয়ে নেড়ে চেড়ে। আনুর খুব বাহাদুর মনে হচ্ছে নিজেকে। সেও তো ছিল পানু ভাইর সঙ্গে।

মা দেখেই বলে উঠলেন, সারাদিন চরে-চরে ঘুরে চেহারা কী করেছে দুজন। এ বদ নেশা তোর কোত্থেকে এলো পানু? ওখানে এই করে বেড়াস নাকি?

হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে। রেল কোম্পানির জামাই কিনা আমি।

আনু যেন চুপসে যায়। মা যে কী একটা! মা তাকে ধমকে ওঠেন, এখন পড়তে বসো গে। আর ঝিমিয়ে কাজ নেই।

উঃ, আনুর সারা গা এমন মটমট করছে, একটু শুতে পেলে ভারী ভালো হতো। তার কি উপায় আছে? রান্নাঘর থেকে তার পড়বার টেবিল যে দেখা যায়। আনু গিয়ে বই নিয়ে বসে। মন বসে না বইয়ের পাতায়। চোখের সামনে বারবার ফিরে ফিরে আসে দুপুরের রোদে জ্বলা নদীটার ছবি। যেন জীবনে আর কখনো সে যেতে পারবে না সেখানে। আস্তে আস্তে বইয়ের ওপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে আনু তা নিজেও জানতে পারে না। প্যাচা-মুখ ঘড়িটা তার চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে টিক-টি-টিক করে চলে অবিরাম।

.

যাবার দিন সকালে তনুকে ডেকে ছোট ছিপটা দিয়ে দিলেন পানু ভাই। আর দুটো বশী, দু রকম। বললেন, মা-কে বলিস না কিন্তু। আর শোন, ছুটির দিন ছাড়া খবরদার যাবি না। যেতে হলে ইয়াসিনকে সাথে নিয়ে যাস।

আচ্ছা।

যা বলবে, তাতেই রাজি আনু। এত খুশি হয়েছে সে ছিপটা পেয়ে। পানু ভাই যে কেন একটা আস্ত ছিপ তাকে দান করে দিলেন, ভেবে কিসসু কুলকিনারা করতে পারে না। ভারী অবাক লাগে তার। বিশ্বাসই হতে চায় না। ছিপটা সে লুকিয়ে তুলে রাখবে ঘরের চালে, কেউ দেখতে পাবে না। মাঝে মাঝে বার করে দেখবে। আবার তুলে রাখবে।

মা–বাবাকে সালাম করে বাড়ি থেকে বেরুলেন পানু ভাই। মা দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে রইলেন। আপারা বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেই টমটমটা এসেছে আজ। ইয়াসিন মাল তুলে দিয়ে জোর–পায়ে চলল ইস্টিশানের দিকে। আনুও উঠে বসলো টমটমে। বাবা ভেজা গলায় বললেন, পৌঁছে চিঠি দিস পানু।

তারপর মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন, খোদা হাফেজ। আল্লাহু গফুরুর রহিম।

আপাদের দিকে তাকিয়ে পানু ভাই ছবির মতো হাসলেন।

আসিরে।

টমটম চলতে লাগল। সারা রাস্তায় একটা কথা হলো না দুজনের। পানু ভাই যদি দেখে ফেলেন আনুর চোখে পানি টলটল করছে। সে বসে বসে ছিটের নকশী খুঁটতে থাকে; মনটাকে জোর করে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু আর বুঝি পারা যাবে না। বুকের মধ্যে হু–হুঁ করছে আনুর।

গাড়িতে উঠে একটা টাকা দিলেন তাকে পানু ভাই। তারপর ছাড়বার সময় হলে ইয়াসিনের সঙ্গে নেমে এলো সে। ইয়াসিন হাত তুলে বলল, সালাম খোকাবাবু, সালাম।

বাঁশি বাজল। হুইসিল পড়ল। শেষবারের মতো ঢং ঢং করে উঠল ঘণ্টা। হিস–হিস করে উঠল ইঞ্জিন। সরে যেতে লাগল পানু ভাইয়ের গলা বাড়ানো জানালাটা। আনু হাঁটতে

লাগল সঙ্গে সঙ্গে। তারপরে দৌড়লো। তারপর হঠাৎ থেমে গেল প্ল্যাটফরমের শেষপ্রান্তে। গাড়িটা ঝক ঝক করতে করতে বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরের বাকে। আনু চোখ ফিরিয়ে দেখে তার চোখ বরাবর ইস্টিশানের খাড়া সাইনবোর্ড মহিমপুর। বাংলা, উর্দু আর। ইংরেজিতে লেখা। লেখাটাই যেন কিছু পড়তে পারছে না সে। ইয়াসিন তার হাত ধরে বলল, চলিয়ে ছোটা খোকাবাবু। আপনি ভি এরকম কেতো যাইবেন নৌকরি লিয়ে। হাঁ, সাচ বোলছি। হাঁ, হাঁ।

৭. ছিপটা নিয়ে সহজে বেরোনো হয় না

ছিপটা নিয়ে সহজে বেরোনো হয় না আনুর। মা যা রাগ করেন। প্রথমদিন যখন ছিপটা দেখলেন একেবারে খেপে উঠলেন, ও কি! ও আবার কি! পানুর এই আক্কেল। নিজে গোল্লায় গেছে, আবার ছোটটাকে ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

আরেকটু হলেই ছিপটা নিয়ে মা দুখানা করে ফেলতেন। আনু ধা করে হাতে নিয়ে দে ছুট। ডাকবাংলোর পুকুরে ছিপ ফেলে বসেছিল আনু। মা-র জন্যে মনটা অশান্তি লাগে। সেদিন পানু ভাইয়ের সঙ্গে যেমন, তেমন একটুও মনে হয় না। শুধু সারাক্ষণ কেমন ভয় ভয়। একটা মাছ ধরতে পারল না আনু। যাঃ, মনটাই খারাপ হয়ে গেছে আনুর।

তারপর থেকে একেকদিন বিকেলে আনু ছিপটা বের করে যেত না কোথাও। বাইরের ঘরে মাস্টার সাহেবের বিছানায় বসে সারাক্ষণ হাত বুলোত, দেখত নাড়াচাড়া করত। তার চোখের ভেতরে ফিরে আসত সেদিন দুপুরের নদীটা, খা খা করা পাড়, নীলচে ধূসর রং রিঠা মাছটা। যা মজা হয়েছিল খেতে। আনুও ধরবে ও রকম। একদিন সে নদীতে যাবে।

মাস্টার সাহেব বলেন, ছিপের ইংরেজি কি বলোত?

আনু জানে না, এতো জানাই কথা। মিষ্টি মিষ্টি হাসেন মাস্টার সাহেব। শেষে বলে, ফিশিং রড। দিস ইজ এ ফিশিং রড।

একটা রুমাল দেখে চমকে ওঠে আনু। সেদিন না সে দেখল এই রকম একটা রুমালে ফুল তুলতে বড় আপাকে। মাস্টার সাহেব তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে অপ্রস্তুত গলায় বলে ওঠেন, ইস্, কী গরম পড়েছে!

তা সত্যি। পানু ভাই চলে যাওয়ার পর কয়েকমাস কেটে গেছে। শীত আর নেই। জোর গরম পড়তে শুরু করেছে। শীগগীরই হয়ত কালবোশেখী শুরু হয়ে যাবে। এদিকে নাকি একবার ঝড় তুফান উঠলে আর থামতে চায় না।

আনুর এখন ফুটবল খেলায় ভারী নেশা পেয়ে গেছে। সেই মনিরদের ওখান থেকে এসে বিকেলে সে যেত ইস্কুলের মাঠে। প্রথমে খেলা দেখত ছেলেদের তারপর আস্তে আস্তে করে সে নিজেই একজন ভারী খেলোয়াড় হয়ে উঠল। এখন তাকে না হলে চলে না। এ দল ও দল টানাটানি করে। খুব ভালো গোল দিতে পারে আনু। একটা এমন ঝেড়ে কিক দিতে পারে গোলির বাবা পর্যন্ত টের পায় না কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়। আর ইস্কুলের খেলা তো! নিয়ম কানুন কিছু নেই। যার পায়ের কাছে বল সেই রাজা। পিন্টু পর্যন্ত তাকে আজকাল সমীহ করে চলে। তার সাথে আজকাল খাতির হয়ে গেছে আনুর। পুরনো কথা ভুলে গেছে। সে। পিন্টুর সঙ্গে গলা ধরে একেকদিন যায় ওদের বাড়িতে। ওর মা কত কী খেতে দেন। গল্প করেন। একেবারে ঠিক তার মার মতো। তার মতোই পাঁচ বোন পিন্টুর। বড়জন ঠিক বড় আপার মতো বড়। বাসায় এসে পিন্টুদের কত গল্প করে আনু। মেজ আপা তার সঙ্গে ঠোনা দিয়ে বলেন, তো যানা, বকশীদের বাড়িতে গিয়েই থাক তুই।

তখন রেগে যায় আনু।

যাঃ আমি বুঝি তাই বলছি। যা, আমি অব কিছু বলবো না কোনদিন।

সেদিন পিন্টু খেলাশেষে ওদের বাসায় যেতে টানছিল। আনু বলল, না ভাই, রাত হয়ে যাবে, মা বকবে।

সত্যি বেলা একেবারে পড়ে এসেছে। আশটা কেমন লাল দেখাচ্ছে। পথের ধারে কেরোসিনের বাতিগুলো দৌড়ে দৌড়ে মই লাগিয়ে সাফ করছে চৌকিদার। পথ দিয়ে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ কেমন গা ছমছম করে উঠল আনুর। বারবার পেছনে তাকাল, ডানে তাকাল, বামে তাকাল। কে যেন পাশে পাশে আসছে তার। পায়ের আবছা শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন, অথচ চারদিকে কেউ নেই। আনু প্রায় দৌড়ুতে থাকে। বাসার কাছে এসে যখন পৌঁছায় তখন ভরসন্ধ্যে। দূরের মসজিদ থেকে আজানের ক্ষীণ করুণ ধ্বনি থেমে থেমে ভেসে আসছে। ঝোঁপঝাড়গুলো একেবারে আঁধার হয়ে গেছে। এরি মধ্যে জোনাকি বেরিয়েছে। একটা দুটো।

বাসার ভেতরে পা দিয়েই যেন বোকা হয়ে গেল আনু। এখনো বাতি জ্বালেনি কেন কেউ? কি হয়েছে? ও কি! মাথা ঘুরছে আনুর। বুকটা খালি লাগছে। আঁধার বারান্দায় ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে মা, আপারা ডুকরে কাঁদছেন। এত কাঁদছেন যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কাটা কবুতরের মতো ছটফট করছে রুদ্ধ আওয়াজ। এমনকি বাবা পর্যন্ত অন্ধকার ঘরে

চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো ডেকে ডেকে কাঁদছেন। আনুর গলা যেন বুজে এলো। সেও যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছে না আর। তার হাত-পা সব পাথর হয়ে। গেছে। স্থানুর মতো সে দাঁড়িয়ে রইলো উঠোনে। তখন বড় আপা ছুটে এসে তাকে বুকে। চেপে ধরলেন।

টেলিগ্রাম এসেছে, পানু ভাই রেলের নিচে কাটা পড়েছেন।

পানু ভাই! চিৎকার করে উঠল আনু। সে চিৎকার বাইরে কেউ শুনতে পেল না। এক নিঃশব্দ, অন্ধ, তাড়িত পাখির মতো চিৎকারটা তার বুকের মধ্যে ফেটে পড়ল, ঘুরতে লাগল। মা তার মাথার ওপরে গাল রেখে আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন চেতনা হলো আনুর, দেখল তার সারা মুখ অশ্রুতে ভারী হয়ে ফুলে উঠেছে। বাবা চেয়ারে বসে কেবল মাথাটা এপাশ ওপাশ করছেন আর আঃ আঃ ধ্বনি উঠছে অস্পষ্ট।

পরদিন রাতের ট্রেনে কাঠের বাক্সে সিল করা লাশ এলো পানু ভাইর। একটা কোলের বাচ্চা রেলের ওপর পড়ে গিয়েছিল, আর তখন ট্রেন আসছিল হু-হু করে, বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর জীবন নিয়ে গেল ট্রেন।

ডাকবাংলোর পেছনে, ভোরে, ফজরের নামাজের পর দাফন করা হলো। আনু মাটি দিল দুমুঠো ইয়াসিন তার হাতে মাটি তুলে দিয়েছিল। বাবার হাত শক্ত করে ধরে হাফেজ সাহেবের পেছনে পায়ে পায়ে ফিরে এলো আনু। পেছনে পড়ে রইলো সদ্য ঢাকা কবরটা। তার ওপরে বড়ই গাছের একটা ডাল পোতা। ঝুরঝুরে ধূসর মাটিগুলো ভিজে

ভিজে। পাশে। বাঁধানো ঘেরা কবর থেকে মিষ্টি ফুলের ভারী একটা সুঘ্রাণ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ডাকবাংলোর পাশে ঘুমটি ঘরে বুড়োটা বাঁশের মাচায় বসে হুঁকো টানছে। মুড়ি মুড়কির। দোকানে ঝপ উঠলো এইমাত্র। একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে খলিলগঞ্জের দিকে ক্যাচ-ক্যাঁচ কাঁচ-কাঁচ করতে করতে। পিড়িং পিড়িং করে শালিখগুলো উড়ে যাচ্ছে, বসছে, আবার উড়ছে। আর পানু ভাইকে দেখতে পাবে না আনু। শরীরটা একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে। গিয়েছিল তাই ওরা বাক্সে সিল করে দিয়েছে। না হলে বাবা-মা-ভাই-বোনেরা যে দেখে কষ্ট পাবে! আনু আর কোনদিন দেখতে পারবে না।

মাস্টার সাহেব আনুর কাঁধে হাত রাখলেন। বাবা গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। দুদিনে যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তার। শাদা চুলে মাথাটা ছেয়ে গেছে, খিলাল করেননি, এলোমেলো হয়ে গেছে সুন্দর একমুঠো তীব দাড়ি, চোখে কালি পড়ে গেছে, হাতের কবজি কত চিকন মনে হচ্ছে।

আনুকে মাস্টার সাহেব কোলের কাছে টেনে মুখটা মুছিয়ে দিলেন। তারপর তাকে বিছানার পাশে বসিয়ে চুপ করে রইলেন। যেন কিসের অপেক্ষা করছে দুজন।

তারপর থেকে গোটা বাসাটাই কেমন যেন বদলে গেল। কথা বলতে ভয় করে, হাসতে টান। পড়ে বুকের মধ্যে। আনু যেন কেমন একেলা হয়ে যায়। রোজ সকালে উঠে পড়তে বসে, ইস্কুলে যায়, ফিরে আসে, রাতে বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে জেগে থাকে—- এ বাড়ির কারো সাথে যেন তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে একটা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। এখন একেকদিন ছিপ নিয়ে বেরোয় মাছ ধরতে, কেউ আর তাকে কিছু বলে না। এখন আনু

ভালো মাছ ধরতে শিখে গেছে। মাছগুলো সে বাসায় আনে না। ফেরার পথে যদি রাস্তায় ভিখিরি ছেলেমেয়েরা ভিড় করে তাদের দিয়ে দেয়। নইলে সেপাই ব্যারাকে গিয়ে ইয়াসিনকে। আনু যখন ছিপ নিয়ে বসে পানির মধ্যে পানু ভাইয়ের চেহারাটা ভেসে ওঠে। মাথার চুল উলুটিয়ে সিথি করা, হা–হা করে হাসছেন।

একেকদিন ভোরে বাবা তাকে নিয়ে যান পানু ভাইর কবর জেয়ারত করতে। বাবা তাকে আগাছাগুলো তুলে ফেলতে বলেন। আনু উপুড় হয়ে পড়ে, দুহাতে বাজে গাছগুলো তুলে ফেলে। মাটি আর মৃতের একটা মেলানো ঘ্রাণ তার সমস্ত বোধ আচ্ছন্ন করে ফেলে। আনুর যেন কোনো জ্ঞান থাকে না আর।

মাঝে মাঝে মা এক কোণে বসে অঝোরে কাঁদেন। সেজ আপা সেলাই করতে গিয়ে কাঁদেন। হাতের সুই, সুতো নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন। বড় আপাকে যেন আর দিনের আলোতে দেখা যায় না। সারাদিন সবার আড়ালে আড়ালে তিনি ঘুরে বেড়ান।

বাবাকে আর কোনদিন আনু দেখেনি, ভোরে সেই হাসিভরা উজ্জ্বল মুখ নিয়ে শিউলি তলায় পায়চারি করতে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে আর আনুকে ডাকেন না বাবা। আনু আর কুস্তি শিখতে যায় না ইয়াসিনের কাছে।

.

পুরো এক বছর হতে চলল আনুরা মহিমপুরে এসেছে। আবার শীত পড়ছে মন্থর গতিতে। গভীর রাতে গায়ে কাঁথা না দিলে গা কেমন শিন্-শিন্ করে ওঠে। হালকা কুয়াশা চাঁদরের মতো জড়িয়ে ধবে গাছগুলো। আর নিম গাছের ফাঁক দিয়ে একটু পরে যেটুকু রোদ এসে ছিটিয়ে পড়ে তাতে বসে থাকতে বেশ ভালো লাগে। গাছে গাছে পাতা ঝরছে। পাতা পড়ছে। কেমন যেন উদাসীন মনে হয় এবারের শীত।

এক সকালে বাবা আনুকে বললেন, ভাবছি, আনু তোকে সামনের বছর বড় স্কুলে ভর্তি করে দেব। বোর্ডিং-এ থাকবি।

কথাটা শুনেই মা প্রতিবাদ করে ওঠেন, হ্যাঁ, অতটুকুন ছেলে বাপ-মা ছেড়ে বিদেশ বিভুয়ে থাকবে।

কেন তাতে হয়েছে কী? বারবার স্কুল বদলাতে হয় আমার সাথে সাথে, তাতে লেখাপড়া কিসসু হয় না। তার চেয়ে বোর্ডিং-এ দেওয়া ঢের ভালো মানুষ হবে।

বোর্ডিং-এ থাকা সে তো ঢের খরচ। আনু (তা জানে, বাবা কত গরিব। তবু বাবা কেন তাকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়াতে চান? বুক ঠেলে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো আনুর। মাথা নিচু করে সে। নাশতা করতে লাগল। বাবা একবার আনুর মুখের দিকে তাকালেন। মা বললেন তাকে, তোমার চায়ে একটু দুধ দেব?

হ্যাঁ, দাও।

আনমনে উত্তর করলেন বাবা। তারপর আস্তে আস্তে চাটুকু খেয়ে বেরিয়ে গেলেন আর একটা কথাও না বলে। আনুর চুলে হাত রাখলেন মা। বুলিয়ে দিতে দিতে মিষ্টি করে জিগ্যেস করলেন, তুই বোর্ডিং-এ থাকবি আনু?

আনু বুঝতে পারে, মা তাকে যেতে দিতে চান না। তখন মার জন্যে খুব মায়া করে আনুর। উত্তরে কিছুই বলতে পারে না সে। ম্লান একটুখানি হাসে শুধু। মা তাকে আরো আদর করতে থাকেন।

শীতকালের আকাশ আয়নার মতো পরিষ্কার। কখনো সখনো এক আধ টুকরো সাদা মেঘ খেয়ালির মতো ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। আর মাঝে মাঝে উত্তরে মেঘের ঝাঁপটে ধোঁয়াটে মেঘ আকাশ ভরে তোলে। শুকনো হিম-হিম বাতাস হু-হু করে বয়।

পড়তি বিকেলে বাইরের ঘরে বসে একটা কাগজ থেকে ছবি কাটছিল আনু। এমন সময় দমকা এক হাওয়া ঘরের ভেতরে ঢুকে আনুর হাত থেকে কাটা ছবিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল আচমকা। ছবিটার পেছনে ধাওয়া করে বাইরে এসে আনু দেখে আকাশ জুড়ে কালো মেঘ, মেঘের ওপর মেঘ জমেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে দিনের আলো, রাস্তায় লোকেরা দৌড়চ্ছে, বাতাস বইছে এলোমলো। এক্ষুণি বোধ হয় ঝড় উঠবে।

ঝড় উঠবে কি, ঝড় উঠে গেছে ততক্ষণে। আকাশ চিরে ঝলক দিয়ে উঠল বিদ্যুৎ-এর আগুন। একবার, দুবার, বারবার খোলা দরজাটা আছড়ে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

স্তব্ধ হয়ে গেল আনুর হৃদস্পন্দন। দৌড়ে গিয়ে যখন দরজাটা বন্ধ করল সে, তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

শোবার ঘরে মা একেলা রয়েছেন। ভাবতেই ভেতরটা হিম হয়ে গেল আনুর। ঝড় বৃষ্টিকে মা-র যা ভয়। সামান্য একটু বৃষ্টি নামলেই সারাটা শরীর তাঁর থরথর করে কাঁপতে থাকে। সবাইকে বুকের কাছে নিয়ে ঘরের এককোণ ঘেঁষে বসে থাকেন। আর বিড়বিড় করে আল্লাকে ডাকেন আল্লা, বৃষ্টি থামিয়ে দাও। ভয়, এখুনি হয়ত ঘরদোর সব ভেঙে পড়বে মাথার ওপর। সয়লাব হয়ে যাবে দুনিয়া। আর আজ যা ঝড় বৃষ্টি নেমেছে, না জানি একেলা অন্ধকার ঘরে বসে মা কী করছেন।

প্রবল বাতাসের মধ্যে একবার যেন আনু শুনতেও পেল, আনু, বাবা আনু।

এত ক্ষীণ সে ডাক যে আনু ভালো করে বুঝতেও পারল না, তার আগেই মিলিয়ে গেল ডাকটা। কান পাতলো আনু, আবার ডাকছেন বুঝি। আনু এখন বাতাস ভরে কেবল মা-র কণ্ঠই শুনতে পাচ্ছে।

আনু, ও আনু।

মা ডাকছেন। বাতাসে একটা অনবরত হুইলের মতো আওয়াজ। আর তারই ভেতর থেকে উঠে আসছে ডাকটা। আনু চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিছুই সে বুঝতে পারে না কী করবে। তার ভীষণ প্রস্রাব পায়।

এমন সময় শোবার ঘরে ভারী কী যেন একটা ঝনঝন করে পড়ে গেল। আর সেই সঙ্গে রক্ত জমানো চিৎকার। বৃষ্টির মধ্যে একলাফে বেরুলো আনু। বেরিয়ে ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে। ঢুকলো। এই টুকুতেই সারা গা তার ভিজে গেছে। কিন্তু সেদিকে চোখ নেই তার। তাকিয়ে দেখে মা চৌকির এককোণে বসে গোঙাচ্ছেন, নিঃশ্বাস ফেলছেন জোরে জোরে। এক মুহূর্ত আনু বোকার মতো তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর চিৎকার করে ডাকে, মা, ও মা, মা। মা কোনো কথাই বলছেন না। হাঁপাচ্ছেন। কাঁদছেন। আনুর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। আনু পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে, মেঝের ওপর একরাশ ছোটবড় ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে সেই বড় ছবিটা, সব্বাইয়ের গ্রুপ ফটো, আনু তখন কোলে, মিনু আপা তখন হাফপ্যান্ট পরে। আর দেয়ালের যে জায়গাটায় ছবিটা ঝোলানো ছিল সে জায়গাটা বিশ্রী রকমে ফাঁকা। দুএকটা ঘেঁড়া মাকড়শার জাল হাওয়ায় কাঁপছে। আনু চোখ ফিরিয়ে আনে। দুহাতে মাকে ধরে আবার ডাকে, মা, মাগো।

তখন আনুর হঠাৎ ভয় হলো। ভীষণ ভয় হলো। মা চোখ বড় বড় করে হাঁপাচ্ছেন। আনুর মনে হলো, মা এক্ষুনি পড়ে যাবেন।

কী করবে ভেবে না পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল আনু। তারপর নিঃশ্বাস নিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে প্রাণপণে ছুটে চলল থানায়, বাবার কাছে। তীরের মতো বৃষ্টির ফলা বিধছে শরীরে, মাথায় মুখে। জামাটা বুকে পিঠে লেপটে গেছে। চোখ আবছা হয়ে আসছে পানির

ঝাঁপটায়। আনু তবু পাগলের মতো দৌড়ুচ্ছে! যখন থানার কাছে গিয়ে সে পৌঁছুলো তখন যেন তার মধ্যে সে আর নেই।

বাবা একটা অচেনা লোকের সঙ্গে নিচু গলায় কথা কইছিলেন। আনুকে হঠাৎ এসময়ে এভাবে দেখে চমকে উঠলেন যেন।

আনু!

শীগগীর বাসায় চলো, মা কেমন করছে।

কেন, কী হয়েছে?

বাবা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু আনু কি বলবে? কি জবাব দেবে এর? মা র কী হয়েছে কি করে বোঝাবে সে? কিছুই বলতে পারল না সে। অচেনা লোকটার জন্যে আরো লজ্জা করল। লোকটা কেমন ছুরির মতো চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আনুর বিশ্রী লাগছে। কথ জড়িয়ে এলো তার। কোনোরকমে সে বলল, বৃষ্টিতে না ভয় পেয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাবা চিৎকার করে উঠলেন, আর তুমি তাই বাসা ছেড়ে এসেছ? বৃষ্টিতে ভিজেছ?

চমকে উঠল আনু। যেন উনি তার বাব; নন। বাবাকে এরকম চিৎকার করতে, বকতে, কোনদিন শোনেনি আনু! এ কি হয়েছে তার বাবার? ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল

আনু। ঠকঠক করে বৃষ্টি ভেজা ঠাণ্ডায় সে কাঁপতে লাগল। বাবার চোখের দিকে তাকাতে তার প্রবৃত্তি হলো না।

ভারী রাগ হলো তার। এত রাগ হলো যে কোনো কথা না বলে সে বাবার কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। এতো রাগ হলো, ইচ্ছে হল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে একটা অনর্থ করে বসে আনু।

পেছনে কার পায়ের আওয়াজ পেল সে। তাকিয়ে দেখে, বাবা। তিনি খপ করে তার হাত ধরে টান দিয়ে বললেন, বৃষ্টিতে আবার ভিজে চলেছ কোথায়? দিন দিন বখাটে হয়ে যাচ্ছ, না? একদিন ধরলে মেরে লাশ বানাবো।

বাঁ পায়ের ওপর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল চাপিয়ে খুঁটতে থাকে আনু। বিস্ময় তার বাঁধ মানছে না। এ কী হয়ে গেছেন তার বাবা? আজ এরকম করছেন কেন? বাবা আবার চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, এক গা পানি কাদা নিয়ে দৌড়ে আপিসে ঢোকা এই তোমার আক্কেল।

বৃষ্টিতে ভয় পেলে আমি কি করব। আমি কি করতে পারি?

ইয়াসিন।

ডাক শুনে ইয়াসিন দৌড়ে এসে হাজির হয়।

যাও, একে ছাতা করে দিয়ে এসো।

আনু বাসায় ফিরে এসেছে পাঁচ মিনিটও হবে না, বাবা এসে উপস্থিত। বারান্দায় চুপ করে বসে ছিল আনু। তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন বাবা। বৃষ্টি এখন অনেকটা কমে গেছে। পাশের বাড়িতে আপারা আটকে ছিলেন, ওরাও এসে গেলেন একটু পরেই।

ছবিটা, ছবিটা ভেঙেছে কে?

বাবা প্রশ্ন করেন অবাক হয়ে। মা–র গলা শোনা যায়, বাতাসে ছিঁড়ে পড়ে গেছে।

বাতাস? ও।

বাবা আর কোনো কথা বললেন না। বারান্দা থেকে আনু দেখতে পেল, বাবা ভাঙা ছবিটা তুলে আলমারির তাকে উঠিয়ে রাখলেন। বাইরে আকাশ শান্ত। আর ঘরের ভেতরটা চুপচাপ। কারো কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না।

একটু আগেই বাবার ওপর খুব রাগ হয়েছিল আনুর, এখন যেন তা আর নেই। বদলে, কেমন লজ্জা করছে, অনুশোচনায় ভরে আসছে মন। সত্যি ওভাবে দৌড়ে যাওয়া ঠিক হয়নি তার। কতরকম লোক আসে বাবার কাছে, বাবা হয়ত জরুরি আলাপ করছিলেন। লোকটার চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে আনুর। কালো, চাপদাড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি,

হাতে আংটি। ছুরির মতো চোখ তার। লোকটার আঙুল দশটা সারাক্ষণ অস্থির হয়ে টেবিলে এটা নাড়ছিল, ওটা ঠেলে রাখছিল; লোকটা আনুর দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। আনুর মনে হলো, তারই ভুল হয়েছে। বাবা রাগ করেছেন। নইলে কখনো বাবা তাকে বকেন না। আনুর কেমন ইচ্ছে হলো এখন বাবাকে একটু দেখতে। দরোজার কাছাকাছি সরে এসে চোর-চোখে আনু তাকাল ভেতরে। দেখল, বাবা একমনে বসে জুতোর ফিতে খুলছেন।

আনু জানে না রাত এখন কত। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেছে তার। আজকাল রাতে এরকম হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে যায় আনু। বুকের মধ্যে ভয় করতে থাকে। পানু ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। চোখের সামনে যেন দেখতে পায় রক্তাক্ত দু খণ্ড দেহটা। কাঠ হয়ে পড়ে থাকে আনু। ভারী তিয়াস পেল তার। চোখ মেলে দেখে পায়ের কাছে চৌকির নিচে হারিকেন জ্বলছে ছোট হয়ে। আনু বিছানা হাতড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘুম জড়ানো চোখে দুএক পা এগিয়েছে সে, এমন সময় কী যেন চোখে পড়ল তার। ঘরের ও পাশটায় খানিকটা জায়গা নিকষ অন্ধকার। একটা কুকুর অবিকল মানুষের মতো কেঁদে উঠল বাইবে। শুকনো গলায় আনু জিগ্যেস করল, কে? অন্ধকারটা নড়ে চড়ে উঠল।

আমি আনু, আমি।

বাবা। বাবা কথা কয়ে উঠলেন। যেন কী একটা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন তিনি। গলাটা তাই কেমন জড়ানো। আনু এক পা এগিয়ে এসে বলল, পানি খাব।

হুঁ।

পানি খেয়ে এসে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল আনু। বাবা তো এত রাত অবধি কোনদিন জাগেন না। নির্জন অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসে বাবা কি ভাবছেন? সারাটা শরীর কেন যেন কাঁটা দিয়ে উঠল আনুর। বুকের ভেতরটা পাথরের মতো ভার হয়ে এলো।

বেশ খানিক্ষণ পরে আনু টের পেল বাবা উঠে দাঁড়ালেন। হারিকেনটা হাতে নিয়ে বড় করলেন তিনি। তারপর আনুর বিছানার পাশে এলেন। আনু চোখ বুজে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলো।

অনেকক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন আনুর পাশে। তারপর তার গায়ের কথাটা ভালো করে টেনে দিলেন। মশারিটা গুঁজে দিলেন আবার।

ঘুমে জড়ানো গলায় মা ও ঘর থেকে বললেন, তুমি শোওনি এখনো?

বলতে বলতে মা এলেন এ ঘরে। বাবা গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। মা তাঁর পায়ের কাছে বসলেন। বাবা বললেন, ছেলেটাকে হঠাৎ তখন বকেছি, মেজাজ ভালো ছিল না। ভারী রাগ করেছে দেখছি।

মা কোনো কথা বলেন না। বাবা আবার বলেন, সন্ধ্যে থেকে মুখ ভার করে আছে। খারাপ লাগছে এখন নিজেরই। অমন করে না বকলেই হতো।

আনুর তখন ইচ্ছে হলো, উঠে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে আমি একটুও রাগ করিনি।

মা হঠাৎ বললেন, তুমি কদিন হলো অমন ছটফট করছো কেন?

কোথায়?

তুমি না বললে কি হবে, আমার চোখ নেই?

বাবা তখন হাসলেন। ঢেউ ভাংগার মতো শব্দ হলো যেন। বললেন, ও তোমার চোখের ভুল।

রোজ এত রাত জেগে থাকলে, এত ভাবলে, কি থাকবে তোমার শরীরে? কি ভাবো এত? অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বা উত্তর করলেন, ভাবি, হাশরের মাঠে আল্লাহ, যখন ডাকবেন, গোলাম হোসেন। আমি তাকে মুখ দেখাবো কী করে?—- এবার আর ভাববো না পানুর মা। হাশরের মাঠে বলব, আমারে তুমি কি বাকি রেখেছিলে যে আমি তোমার রশি শক্ত করে ধরে থাকব। জীবনে পাপ করি নাই সজ্ঞানে, পানুর মা, তাই ঘুম হয় না।

আনু বুঝতেই পারে না, বাবা এ সব কী বলছেন? সব চেনা শব্দ, অথচ একসঙ্গে তাদের কোনো অর্থই স্পষ্ট হচ্ছে না তার কাছে। একটা ধাঁধার মতো লাগছে। কেবল এটুকু বোঝা যাচ্ছে, কী একটা ভাবনায় বাবা কদিন থেকে দিন রাত ডুবে আছেন। বাবা একটু পর বললেন, আবার বৃষ্টি আসবে বোধ হয় বাতাস বইছে।

মা তখন আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।

পরদিন বাবা মফস্বল গেলেন। আনু স্কুল থেকে সবে ফিরেছে তখন। দেখে কাপড় চোপড় সব গোছানো হয়ে গেছে। ইয়াসিন সাইকেল পাম্প করছে।

বাবা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাইকেল হাতে নিলেন। পেছনে মা দাঁড়িয়েছিলেন। একবার তাকালেন শুধু। তারপর ধীরে ধীরে রাস্তায় গিয়ে উঠলেন। আনু তার পেছনে পেছনে চলল। খানিকটা পথ যাবার পর বাবা সাইকেল থেকে নেমে ডাকলেন, আনু।

একদৌড়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল আনু। হড়বড় করে ভাঙা গলায় তিনি বললেন, আমার হাতঘড়িটা ফেলে এসেছি টেবিলের ওপর। শীগগীর যা।

বাবার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঠোঁট দুটো যেন কাঁপছে। আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন শুধু শুধু। বাসা থেকে দৌড়ে ঘড়িটা এনে তার হাতে দিল আনু। ঘড়িটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে বাবা বললেন, বাসায় থেকো। বাইরে যেও না খেলতে। কেমন?

আনু ঘাড় কাৎ করে সায় দেয়। তার চোখ পানিতে ভরে আসে। যতদিন বাবা মফস্বলে যান, আনুর খুব খারাপ লাগে। আজ যেন আরো। কদিন থেকে বাবা কেমন অস্থির, সেদিন তাকে বকেছিলেন, রাতে মার সঙ্গে কথা—- এসব আলাদা মনে করে নেই; সব মিলিয়ে একটা অবোধ মমত্ব শুধু, সেটাই তাকে আজ অভিভূত করে ফেলে। সে যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে রইলো। বাবা একবারও তাকালেন না ফিরে। সঙ্গে ইয়াসিন। দুটো সাইকেল দেখতে দেখতে নদীর দিকে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে গেল।

তখন ছিপ নিয়ে বেরুলো আনু। একটু আগেই বাবা বারণ করে গেলেন, তবু। জানে এখন বিকেল ফুরিয়ে আসছে, এখন আর কোথায় মাছ ধরতে যাবে, তবু। তবু সে ছিপ নিয়ে বেরুলো। বেরিয়ে গেল না কোথাও। কালভাটের পাশে ছিপটা হাতে করে ঠায় বসে রইলো। একটা গানের মতো কোথা থেকে সুর উঠছে। আনু ভালো করে কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে। ছোট দারোগার বউ আবার হারমোনিয়ম টিপছে। একটা ঝিমোনো সুর বেরুচ্ছে। সেই সুর লতিয়ে চিনচিনে গলা শোনা যাচ্ছে–আমি যাবো না, যাবো না সই। সেই গানটা তার মনের মধ্যে রাগ এনে দিল। হঠাৎ সে টান অনুভব করল বাড়ির জন্যে। বড় বড় পা ফেলে বাড়িতে এসে সে ছিপটাকে তেল খাওয়াতে লাগল।

.

পরদিন মাস্টার সাহেব কোথা থেকে ছুটে এসে চড়া গলায় ডাকতে লাগলেন। ডাকতে ডাকতে আজ প্রায় বাসার মধ্যেই ঢুকে পড়েছেন তিনি।

আনু, আনু।

কী?

তোমার মা-কে ডেকে দাও তো শীগগীর।

কেন?

আনুর সারাটা শরীর শির শির করে উঠল শুনে। মাস্টার সাহেব এরকম গলায় কথা কইছেন কেন?

দরকারি কথা আছে।

মা এসে দরোজার পাশে দাঁড়ালেন। মাস্টার সাহেব একবার তাকে দেখলেন, একবার আনুকে, তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, আম্মা, থানায় খবর এসেছে দারোগা সাহেব অ্যারেস্ট হয়েছেন।

চকিতে মুখ তুলে তাকালেন মা। কথাটা যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না। আর আনু অবাক হয়ে গেছে। অ্যারেস্ট! মানে হাতকড়া লাগিয়েছে? তার বাবাকে? যেন এরচেয়ে অসম্ভব আর কিছু হতে পারে না। আনু আর দুকানে কিসসু শুনতে পায় না। হা করে তাকিয়ে

থাকে। মাস্টার সাহেব রীতিমত হাঁপাচ্ছেন, যেন এক দু মাইল দৌড়ে এসেছেন তিনি। কথাটা শুনে মা-র চোখ ছলছল করে উঠল, মুখখানা বিষ হয়ে গেল, কিন্তু শান্ত কণ্ঠেই জিগ্যেস করলেন, কার কাছে শুনেছ?

ছোট দারোগা সাহেবের কাছে।

ক্রমে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। বড় দারোগা সাহেব এক খুনের মামলায় চার হাজার টাকা ঘুস নিয়েছিলেন। কিন্তু ধরা পড়ে যান। আনুর কেন যেন মনে হয়, সেদিন বৃষ্টিতে দৌড়ে থানায় গিয়ে যে দাড়িওলা পাঞ্জাবি পরা লোকটার সঙ্গে বাবাকে কথা বলতে দেখেছিল, সেই ঘুস দিয়েছিল। কিন্তু কথাটা কাউকে জিগ্যেস করতে পারে না। ছোট দারোগার বউ গায়ে পড়ে এসে মিষ্টি কথা বলে যায় আর মুখ টিপে টিপে হাসে। আবার বলে, বাবা, আমার সাহেবের এ সব নাই। নামাজ রোজা করে না ঠিক, কিন্তু দিল সাফ। আবার কেউ কেউ যাচ্ছে তাই বলে। মুখের ওপর কথা শোনায়।

ছি,ছি, অমন দাড়িওলা পরহেজগার মানুষ। তার এই কাণ্ড?

টিটকিরি দেয় কেউ ঘরে সেয়ানা মেয়ের হাট। তা বুড়ো করবেই বা কী? জন্ম দেবার সময় হুশ ছিল না যে।

আশ্চর্য, কারো ওপরে একটু রাগ হয় না আনুর। বাবার ঘুস নেবার কথা শুনে একটুও ঘৃণা হয় না তার জন্যে। বরং মনটা খারাপ করে। বাবার সঙ্গে যেন এক হয়ে যায় আনু।

বাবা তো গরিব। বাবার টাকা দরকার। মনিরের বাবার কাছে টাকা চাইলেন, দিল না। বাবা কী করবেন: আনু যেন বুঝতে পারে, বাবা কত অসহায়। বাবার জন্যে তার আরো মায়া করে। তখন। সে আপন মনে হাঁটতে থাকে। বশিদের মেয়েরা সব সেজে গুঁজে রাস্তায় বেড়াচ্ছে। সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। এত একা লাগে নিজেকে। মনে হয়, বাবাকে যদি ওরা ছেড়ে দিত, তাহলে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত আনু।

আর বাসায় পানু ভাইয়ের এন্তেকালে সকলে যা না কেঁদেছে, এবার একেকজনে তাই কাঁদল। মা রাধতে গিয়ে কাঁদেন। খাওয়াতে গিয়ে কাঁদেন। আনুর মনে হয়, ঘুমের ঘোরেও কাঁদেন তিনি। বড় আপা কেঁদেছেন সবচেয়ে বেশি। কেঁদে কেঁদে তিনি দরিয়া করে ফেলেছেন। তখন আনুও আর থাকতে পারেনি। তার বুকের ভেতরে একতাল জমাট কান্না বড় আপার কোলে এক সময় ঝরঝর করে গলে পড়ে।

কোনো রাতে সার ভালো ঘুম হয় না অনুর। ছবির মতো মনে পড়ে সেই রাতে তার গায়ে বাবার কথা টেনে দেয়া। পানু ভাইয়ের লাশ এলো। ভোর সকালে বাবার সঙ্গে গোরস্তানে গিয়ে কবর থেকে আগাছা তুলে ফেলা! পথের ওপর দাঁড়িয়ে বাবা হাতঘড়ি বাঁধছেন। মাস্টার সাহেবের পকেট থেকে চেনা রুমালটা বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। সকাল বেলা ঘুম থেকে আধো জেগে উঠে কতদিন কান পেতে দেখেছে আনু, যেন এখুনি সে শুনতে পাবে বাবা সুরা পড়তে পড়তে পায়চারি করছেন। পর মুহূর্তেই ভুল ভেঙ্গেছে তার, আর বুক ঠেলে উঠেছে কান্না।

থানার হুকুমে একদিন এ বাসা ছাড়তে হলো। পানু ভাইয়ের কবর আছে বলে মা কিছুতেই মহিমপুর ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। মাস্টার সাহেব আর আনু গিয়ে বাসা ঠিক করে এলো—- একটা বড় ঘর আর রান্নাঘর, বাইরে শনের একটা ছোট্ট ঘর, ভাড়া আঠারো টাকা। কেমন নোংরা আর নির্জন। আনুর মনটা খারাপ হয়ে যায় বাসা দেখে। কিন্তু এরচেয়ে বেশি ভাড়া দেবার সাধ্য যে তাদের নেই। থানার কোয়ার্টার ছেড়ে আসবার সময় মা আরেকবার কেঁদে উঠেছিলেন। দেয়ালে একদিন পেন্সিল দিয়ে আনু বড় বড় করে লিখে রেখেছিল, বাবার সেই কথা আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ, মেক্স ম্যান হ্যাঁপি অ্যাণ্ড ওয়াইজ—- আসবার সময় ঘষে ঘষে মুছে দিয়ে এসেছে।

সকালে বাসা বদল হলো। বিকেলে মাস্টার সাহেব আনুকে বললেন, আনু, চলো নদীর পাড়ে বেড়িয়ে আসি।

তার সঙ্গে বেড়াতে গেল আনু। বিকেল পড়ে এসেছে। আকাশটা দেখাচ্ছে কেমন কোমল। নদীর ওপারে নীল হয়ে এসেছে গাছপালা, গ্রাম। একটা নৌকা পাল তুলে ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে। ঝাউবনে সরসর করছে বাতাস। এক জায়গায় নারকোল আর গুড়ের নৌকাগুলো গলাগলি ধরে ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে যেন। মাঝিরা কেউ ছইয়ে বসে, কেউ নিচে নেমে গল্প করছে, মশলা পিষছে, হুঁকা টানছে। হাঁটতে হাঁটতে কতদূর চলে এসেছে ওরা।

একটা ফাঁকা জায়গায় বসলো মাস্টার সাহেব। আনুও বসলো। দুজনে চুপ করে দেখতে লাগল নদী। নদীটা কেমন নীল আর লাল মেশানো রং নিচ্ছে—-আয়নায় আঁকা ছবির মতো মনে হচ্ছে। সেদিকে চোখ রেখেই মাস্টার সাহেব ডাকলেন, আনু।

জি।

আনু তাকালো তার দিকে। কিন্তু তিনি ফিরে তাকালেন না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে বললেন, আনু, তুমি এখনো ছোট। তোমাকে এই কথাগুলো বলা এখন ঠিক হবে না। তবু যদি না বলি, তাহলে বড় হয়ে অনেক প্রশ্ন তোমার মনে আসবে, তুমি উত্তর পাবে না। বড় হলে বুঝবে, আজ আমি এ সব তোমাকে বলে ভালোই করেছি।

অবাক হয়ে যায় আনু। কিন্তু চমকে ওঠে না। মনে হয়, স্বপ্নের ভেতর থেকে কথা বলছে মাস্টার সাহেব। মনে হয়, এই তো আনু বড় হয়ে গেছে। বন্ধুর মতো দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। কথা বলছে। সে অপেক্ষা করে। সে যেন জানেই কী বলবেন উনি।

আনু, আমি বড় গরিব। মাস্টার সাহেব বলতে থাকেন, বড় কষ্ট করে লেখাপড়া করছি। তোমার বাবা জায়গির না রাখলে হয়ত বি.এ. পড়াই হতো না আমার। দ্যাখো না, কতদূব। রংপুর, রোজ ট্রেনে যাই কলেজে। তোমার কাছে লজ্জা কি? বিনা টিকিটে যাই। হাতে বই খাতা দেখে, আমার মুখের দিকে দেখে, চেকাররা কিছু বলে না। বুঝলে?

হ্যাঁ।

আবার চুপচাপ হয়ে যায় দুজন। আবার মাস্টার সাহেব বলেন, আনু, তোমার বড় আপাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম মনে মনে। শুধু আমি আর তোমার বড় আপা জানি। আর কেউ জানে না। তোমার বাবার বিপদ, আমি আর ভার হয়ে থাকতে চাই না।

কেন?

অবাক হয়ে আনু জিগ্যেস করে। বড় আপাকে বিয়ে করতে চান মাস্টার সাহেব, সেটা তাকে একটুও লজ্জিত করে না। বরং সে উদ্বিগ্ন হয়ে আবার শুধায়, আপনি চলে যাবেন?

হ্যাঁ আমার যাওয়াই ভালো। জানো আনু, তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে আমি যা কবছি, রুঢ় হলেও দরকার ছিল। আমি চলে যাচ্ছি। তাতে একটা লোক কমবে সংসারে, তোমাদের এমনিতে অভাব, কিছুটা সুবিধে হবে। তাছাড়া তোমার বড় আপাকে আমি যতই ভালোবাসি, এখন যদি থেকে যাই, কেউ নেই তোমাদের সংসারে যে বড়, তাতে লোকে মন্দ বলবে, তোমার আপাদের নামে কুৎসা ছড়াবে। আনু তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে আমি ভালোই করেছি, তোমাদের ভালোর জন্যেই আমি চলে যাচ্ছি। তোমার বড় আপা বোঝে না। তুমি বড় হলে বুঝবে। তোমাকে বলে যাচ্ছি।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন মাস্টার সাহেব। আনু তাকিয়ে দেখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। চোখে হাত দিয়ে দেখে, পানি। পানি মুছে দেখে সন্ধ্যায় কালো হয়ে গেছে নদী। তার কুলকুল আস্তে আস্তে বাড়ছে। দূরে নৌকা থেকে মাঝি আজান দিচ্ছে। একটা তন্দ্রার ঘোরে যেন ঝাউগাছগুলো এখনো একটু একটু নড়ছে।

সে রাতে মাস্টার সাহেব চলে গেলেন।

.

আনু একদিন শুনলো বাবাকে মহিমপুর হাজতে কয়েকদিনের জন্যে নিয়ে এসেছে। সেদিনই সে খোঁজ নিতে গেল। ছোট দারোগা তাকে দেখে নিয়ে গেলেন বাবার কাছে। আনু যেন চিনতে পারে না তাকে। চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে, পরনের জামাটা আধময়লা, কেমন এক শূন্যতা তার চারদিকে। তিনি ব্যগ্র দু চোখ মেলে দেখলেন আনুকে। আনু মাথা নামিয়ে রইলো।

প্রত্যেকদিন আনুরা সবাই যেত বাবার সঙ্গে দেখা করতে। শেষদিন যখন বাবাকে ওরা এখান থেকে নিয়ে যাবে, সেদিন একটু আগেই এলো আনু, আপারা, মা। আনু ছিল সবার পিছনে। কিন্তু বাবা তাকেই ডাকলেন প্রথমে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বারবার ডাকলেন।

আনু, ও আনু, আনু, বাবা।

উঁ।

সংক্ষেপে জবাব দেয় আনু। কী জানি যদি কান্না পেয়ে যায় তার। বাবা তখন তার কানের কাছে মুখ রেখে মাথার ওপর গলাটা ঠেকিয়ে বললেন, তুমি আমার একমাত্র ছেলে। তোমাকে নিয়ে আমার কত আশা, কত ভরসা। ভালো করে লেখাপড়া করবে। লেখাপড়া শেষ হলে কত বড় চাকুরি করবে। কিছুরই অভাব, কিছুরই ভাবনা থাকবে না তোমার। তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। আমি শীগগীই ফিরে আসব।

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, নিঃশব্দে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আনু। দৌড়ে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো অনেক দূরে। বাবা তার মাথাটা আরো কাছে টেনে নিলেন। আরো আদর করতে লাগলেন তিনি। চোখ তুলে তাকালে আনু দেখতে পেত তিনিও কাঁদছেন।

৮. আনু এখন বড় হয়ে গেছে

আনু এখন বড় হয়ে গেছে। এই খবরটা কেবল আনু ছাড়া সবাই জানে। কেবল আনু জানে না, সবাই জানে, আনু এখন বড় হয়ে গেছে।

আগে বেলা করে উঠতে ইচ্ছে করত না তার। সালু আপা একদিন যদি ডাকতে দেরি করত, তাহলে সেদিন সারাদিন তার বেণি আস্ত থাকত না। এখন সালু আপা বেণি করে না, মা-র মতো খোঁপা করে। আনু এখন ভোরে ওঠে।

ভোরে উঠে আর ফুল কুড়োতে ছুটে বেড়ায় না। সবার আগে উঠে, কেবল মা-র পরে উঠে, আনু বড় বড় পা ফেলে বাসা থেকে বেরোয়। মা তখন কুয়োতলায় ওজু করছেন, তার সংগে। একটা কথা পর্যন্ত হয় না!

পথটা ভারী নির্জন হয়ে পড়ে থাকে। যেন কালরাতে কার গা থেকে ছাই-রং একটা শাল পড়ে গেছে, আর ভোলা হয়নি—- আকাশটা তেমনি। যেন মোটা আম গাছটার আড়ালে থেকে বাবাকে এখুনি দেখা যাবে পায়চারি করতে করতে আনুর দিকে আসছেন। তার সমস্ত মুখ সূর্য ওঠার লাল রংয়ে ছবির মতো। তার হাসির ভেতর থেকে যেন সূর্য উঠেছে।

খুব গম্ভীর হয়ে একা একা হাঁটতে থাকে আনু। ডাক বাংলোর পুকুরে এসে পদ্ম দেখে, পাতায় পাতায় একটুও পানি দেখা যাচ্ছে না। একটা দুটো পাতা সরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে

মুখ ধোয় আনু। রাতভর ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ঠাণ্ডা পানিতে চোখের ভেতরটা যেন কাটতে থাকে।

কোনো কোনো দিন আনু সেখান থেকে আসে নদীর দিকে। ধরলার দিকে। ধরলার পাড়ে দাঁড়িয়ে কোনো কোনো দিন হিমালয় দেখা যায়। একেবারে সারা আকাশ জুড়ে নীল মেঘের মতো। তারপর, কখন যেন, একটা মেঘের চূড়া ঝকঝক করে ওঠে। আনুও তখন হাসতে থাকে। তার মনের মধ্যে আর কিছুই মনে থাকে না। না বড় আপার ছায়ার মতো মুখ, মেজ আপার কান্না, সেজ আপার এটা নেই ওটা নেই বলে মুখ ভার, মার রাত জেগে জেগে নামাজ, মিনু আপা বখাটে হয়ে যাচ্ছে, সালু আপার জামা ছিঁড়ে শাদা কাধ বেরিয়ে পড়েছে, বাবাকে জেলে নিয়ে গেছে, পানু ভাই রেলে কাটা পড়ে মারা গেছে, কিছুই মনে থাকে না। সব ভুলে গিয়ে সে দেখতে থাকে —-ঝকঝক করছে, হাসছে।

তারপর দপ্ করে নিভে যায়। বাবা বলতেন, সূর্য একটু উঠে গেলেই আর রোদ পড়ে না, তখন কাঞ্চনজংঘা আবার নীল হয়ে যায়। সেটাও মজা লাগতো। দপ্ করে নিভে যেতেই বাবার হাত ধরে আনন্দে লাফিয়ে উঠত আনু। দৌড়ে বাসায় এসে বাকুম বাকুম করে সেই গল্প শোনাতো। মিনু আপা যদি ঠোঁট উলটে বলত, যা, আমিও দেখেছি তাহলে মনটা ভারী ছোট হয়ে যেত আনুর। বাবা সেটা লক্ষ্য করে মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলতেন, মিনু আর কি দেখেছে? আজকের মতো কোনদিন হয়নি। কি বলিস আনু?

এখন আনু কাঞ্চনজংঘা নিভে যাওয়া পর্যন্ত আর দাঁড়ায় না। তার আগেই চলে আসে। এসে আর গল্পও করে না।

আসবার পথে দেখতে পায় ইস্টিশানের দোকানগুলোয় ডালপুরি বানাচ্ছে গরম গরম। ভারী ইচ্ছে করে একটা কেনে। পকেটে হাত দিয়ে দেখে হয়ত চারটি পয়সাও আছে। কিন্তু কেনে না। পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে শক্ত করে পয়সাটাকে অনুভব করতে থাকে, ঘোরাতে থাকে, হাতের তেলো ঘামতে থাকে। কিন্তু কেনে না। বাসায় এসে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে নাশতা করে। বারান্দায় বসে বসে দেখে, রান্নাঘরে গতরাতের বাসি ভাত নিয়ে বসেছে মেজ আপা, সেজু আপা; বড় আপা বড় এক গেলাসে পানি খাচ্ছেন। কেউ তাকে পড়তে বলে না। একটু পর আনু নিজেই পড়ার বই নিয়ে বসে। আবৃত্তি করে পড়ে না। মনে মনে, মাথা নিচু করে, বারান্দার থাকে ঠেস দিয়ে এক্সিমোদের কথা পড়ে আনু।

সেদিন হঠাৎ অফিস থেকে পিয়ন এসে বলল, আনু মিয়া মাস্টার সাহেব আপকো বোলায়া।

মাস্টার সাহেব? কে মাস্টার সাহেব? আনু জানে না পোস্টমাস্টারকেও মাস্টার সাহেব বলে। তাদের বাসায় জায়গির থেকে পড়ত মাস্টার সাহেব, বাবা যখন জেলে গেলেন, তিনি চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তাকে সব সাদা খাতা, দুটো গল্পের বই, একটা টাকা, কাঁচের দোয়াত দান, পেতলের একটা ছোট্ট বক দিয়ে গিয়েছিলেন। আনু এখন বুঝতে পারে–বাবা যে নেই, তারা খেতে দিতে পারবে না, তাই চলে গিয়েছিল মাস্টার

সাহেব। পানু ভাই বুঝি আগেই টের পেয়েছিল ঘুস নিতে গিয়ে ধরা পড়বেন বাবা, জেলে যাবেন, তাই রেলে কাটা পড়ে ফাঁকি দিয়ে গেল। পানু ভাইয়ের কী? বড় হয়েছে, বি,এ, পাশ করেছে, ঢাকা দেখেছে, ভালো ভালো জামা আর জুতো কিনেছে, বড় বড় জংশনে কাজ করেছে। তার মরে যেতে কী। মরতে একটুও দুঃখ নেই তার।

পিয়নের ডাক শুনে মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরোজার ওদিকে। নিচু গলায় তিনি জিগ্যেস করলেন, আনু জিগ্যেস কর, ওরা ডাকছে কেন?

পিয়নটা উত্তর করে, মা–জি হামারা মালুম নেহি।

আনু ভেতরে আসে। একটা কথাও বলে না! আলনা থেকে বেছে একটা শার্ট বের করে গায়ে দেয়। সুন্দর করে শার্ট ধুয়ে রাখেন মা! নোখ দিয়ে দিয়ে কালারে, বোতামের জায়গায় কুচিগুলো সমান করে রাখেন।

মা বললেন, বুলুকে নিয়ে যা।

বুলু পাশের বাড়ির ছেলে। এবার নাইনে পড়ে। বুলুর মাকে খুব ভালো লাগে আনুর। বুলুর বাবাকেও, বুলুকেও। বুলুদের সবাইকে ভালো লাগে আনুর। বুলুরা কেউ কখনো বলে না, আনুর বাবা ঘুস খেয়ে জেলে গেছে। সারা শহরে শুধু বুলুরাই বলে না। আর সবাই বলে। বলে, আর দাঁত বার করে হাসে। কেবল বুলুরা বলে না। আর বলে না ইয়াসিন সিপাহী। বাবা যখন এখানে দারোগা ছিল, তখন ইয়াসিন বাজার করে দিত।

ইয়াসিন এখনো মাঝে। মাঝে হাট করে দিয়ে যায়। ইয়াসিন আনুকেও বলত, দারোগা সাহেব। বলত, আনু যখন দারোগা হবে তখন তার ঘে। রাখবে ইয়াসিন। আনু দারোগা হবে না। আনু হবে গার্ড সাহেব। পানু ভাই তো ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার। সে হবে গার্ড। রাত দুপুরে ঝক ঝক ঝিক ঝিক করতে করতে তার গাড়ি বানার পাড়া ছাড়িয়ে ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা চলে যাবে। বুলুব বাবা মাসে দুমাসে রোজ ঢাকা যান। দোকানের জিনিস কিনে আনেন। পিন, কলের গান, রেডিও, রেকর্ড, কাঁচে বাঁধানো বিলেতের রাস্তা ঘাট সমুদ্রের ছবি। একটা ছবি খুব ভালো, যেটাতে দুটো ছেলে বসে মাছ ধরছে। আনুও মাছ ধরে। আনুর জন্যে বুলুর বাবা গেল মাসে এক সেট বড়শি আর মুগা সুতো এনে দিয়েছেন। আনু কাল যখন মাছ ধরতে যাবে বুলুর বাবাকে অনেকগুলো মাছ দেবে।

বুলুকে সংগে করে আনু পোস্ট অফিসে এলে। মাথার ওপরে বড় বড় করে লেখা পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস। পানু ভাই যখন মরে গেল তখন টেলিগ্রাম এসেছিল একটা।

পোস্টমাস্টার বললেন, রেলকোম্পানি তোমার বাবাকে টাকা পাঠিয়েছে পানুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে। কে নেবে টাকা? তোমার বাবা তো জেলে। তোমার মাকে নিতে হলে দরখাস্ত করতে হবে সাতদিনের মধ্যে। নইলে টাকা ফেরৎ যাবে।

বেরিয়ে এসে বুলু বলল, কী তুই। বুঝতে পারলি না? তোর ভাই ডিউটিতে মারা গেছে কিনা, তাই টাকা দিচ্ছে।

তবু আনু বুঝতে পারে না। ভাবে রেলের লোকজন খুব লজ্জা পেয়ে গেছে তার ভাই মরে যাওয়াতে, তাই টাকা দিয়ে ভাব করতে চাইছে। দরকার নেই তার টাকার। নেবে না সে টাকা। টাকা দিয়ে কী হবে?

বাবার খুব টাকার দরকার ছিল না। আনু যেন স্পষ্ট শুনতে পায়, একদিন মা রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সব ভাইবোনকে নিয়ে দুধের গল্প করছিলেন। বাবার খুব টাকার দরকার ছিল? চিন্তায় চিন্তায় মাথা ঠিক ছিল না বাবার। বড় আপা, সেজ আপা, ছোট আপা সবগুলোকে বিয়ে দিতে হবে। তাই বাবা ঘুস নিয়েছিল। শুনে মুখ কাচুমাচু করেছিল আপারা। তাদের দেখাদেখি সালু আপা, মিনু আপাও—-ওরা বড় নয় তবু বাবা বলতেন, আনুকে বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াবেন। তার দারোগার চাকুরি খালি বদলি আর বদলি। বোধ হয় আনুর বোর্ডিংয়ের। জন্যেও মেলা টাকা দরকার ছিল বাবার। মুখ ছোট করে আনুও মাথা নামিয়ে নিয়েছিল।

বাসার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল এরা। দেখা যাচ্ছে বকশীদের বাড়ির মাঠে আনুদের ছাগলের বাচ্চাগুলো খুব লাফাচ্ছে। কোরবানির সময় বিক্রি করবেন বলেছেন। ততদিনে ওরা বড় হয়ে যাবে।

আনু কম্পিত গলায় জিগ্যেস করে, বুলু ভাই?

কিরে?

কত টাকা দেবে পানু ভাইয়ের জন্যে।

কী জানি।

বুলু ভাবতে থাকে। আনুর কাঁধে হাত রেখে আচমকা বলে, টাকা পেলে, এবার তোর সালু আপাকে ভালো জামা কিনে দিস।

আনু মুখ তুলে দেখে, বুলুর মুখটা হঠাৎ খুবই ঝকঝকে দেখাচ্ছে। চোখে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিল বুলু। তাড়াতাড়ি বলল, তোর মা সেদিন আমার মাকে বলছিল ও নাকি কিছু চেয়ে নেয় না।

আনমনা হয়ে যায় আনু। কাল বিকেলে ওদের বাসার পেছনে সরু গলিটায় সালু আপাকে দেখেছিল কি যেন বলতে। বুলুকে বলতে। বুলুকে বোধ হয় জামার কথা বলেছে। আনু। বলল, ওর একটা ভালো শাড়ি ছিল। সাইত্রিশ টাকা দাম। বড় আপা সেদিন বেড়াতে যাবে, ওর ভালো শাড়ি নেই দেখে দিয়ে দিল সালু আপা। আর নেয়নি।

দরোজার পাট ধরে দাঁড়িয়েছিলেন বড় আপা। আনু কাছে আসতেই সে জিগ্যেস করল, কিরে?

আনু বলল, টাকা এসেছে।

কার?

পানু ভাইয়ের।

কী ভেবে আনু আবার বলল, আমাদের।

.

পাঁচ হাজার টাকা এসেছিল। বুলুর বাবাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন পোস্টমাস্টারের সংগে দেখা করে। মাস্টার সাহেব নিজে এসে নিজে হাতে টাকা দিয়ে গেলেন আনুর মাকে। সইটা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, চশমা পরে দেখলেন, চশমা ছাড়া দেখলেন। তারপর বুলুদের বাড়িতে চা খেয়ে ছাতা খুলে মাথায় দিতে দিতে চলে গেলেন।

বুলুর বাবা গলা বড় করে ভেতর বাড়িতে আনুর মাকে বললেন, কাল পোস্টাফিসে একটা পাশ বই করেন। এত টাকা কাছে রাখা ঠিক না। আনু, সকালে দোকানে যাবার সময় আমাকে মনে করিয়ে দিও।

রাতে খেয়ে দেয়ে শুয়ে ছিল আনু। এই ঘরটাতে ও থাকে একা চৌকিতে। বাবার বড় পালংকে থাকে মা মিনু আপা আর সালু আপা। ওপাশের ঘরে বড় আপারা। আসলে ঘর একটাই, মাঝখানে হাত তিনেক পথ রেখে বেড়া দিয়ে পার্টিশন করা। ও ঘরে হারিকেন।

এ ঘরটা অন্ধকার। শুয়ে পড়েছে সালু মিনু আপা। ও ঘরে মেজ আপার চুল আঁচড়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেজ আপা গুন গুন করছে, বোধ হয় মুখে সর মেখে শোবে। যেদিন রাতে ও মুখে সর মাখে সেদিন অমনি গুন গুন করে। আনু কতদিন মাছ ধরতে যায়নি। মা বকে, বলে, মাঝি পাড়ায় গিয়ে থাক, এ বাড়িতে আসিস কেন? হাত নিসপিস করতে থাকে আনুর। বুলুর বাবার দেওয়া সুতো বড়শি যে-কে-সেই পড়ে আছে। কাল যদি মাছ ধরতে যায় বুলুর বাবাকে অনেকগুলো মাছ দেবে। কাল যদি মাছ ধরতে যায়, আনু তাহলে কটা মাছ পাবে? তিনটে, না পাঁচটা জিয়োল, এক গণ্ডা বাচা, একটা বড় শোল, দুটো বেলে। বড় আপা বেলে মাছ ভালোবাসে। আর সবাই জিয়োল। মা, যেদিন শোল মাছ হয় খুব সুন্দর করে রাধেন। বাচা মাছ দেবে বুলুর বাবাকে। একটা রুই মাছের বাচ্চা যদি পাওয়া যেতো, হাত দেড়েক, ঝাল ঝাল মাখা মাখা করে রান্না হতো, মাছটা দিয়ে একটুখানি ডাল রান্না করত যদি মা। কিন্তু হাফিজ মিয়ার পুকুর ছাড়া রুই পাবে কোথায় আনু? দেখলে আর কথা নেই। জবাই করে ফেলবে আনুকে। আনুর ঘুম পায়। হাফিজ মিয়ার পুকুরে রুই মাছগুলো যেন দেখতে পায়; কাঁচের মতো পানির নিচে ছবির মতো সব মাথা গুঁজে পানির মধ্যে পড়ে আছে। মাথার পরে খুব রোদ উঠেছে কিনা!

লণ্ঠনের আলো সারমুখে টের পায় আনু। দ্যাখে, মা। মা লণ্ঠন তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ঘুমিয়েছিস?

না।

কিন্তু মা লণ্ঠন নামিয়ে নেন। যেন যাবার উদ্যোগ করেন। বলেন, থাক, তাহলে ঘুমো।

আনু কান পেতে শোনে, এখন আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অনেক রাত হয়েছে নিশ্চয়ই। বড় আপাদের ঘরে বাতিটা নেভানো। আনু উঠে বসে। বলে, কি?

মা খুব দ্বিধা করে আদর নিয়ে বলেন, একটা চিঠি লিখবি আনু? আয়, আমি পোস্টকার্ড কলম বার করে রেখেছি।

আনু তখন উঠে দাঁড়ায়। যেন পড়ার টেবিলে যাবে লিখতে। তারপরই মনে হয় টেবিল তো এ বাড়িতে আনা হয়নি। ঘুমিয়ে গিয়েছিল আনু, সব ভুলে গিয়েছিল আনু।

কলম টলম নিয়ে এসে মা বসলেন চৌকির এক কোণে। মাঝখানে লণ্ঠন রেখে মনোযোগ দিয়ে ছোটবড় করে আলো ঠিক করলেন মা। পোস্টকার্ডটা তেলতেলে হয়ে গেছে। কলম নিয়ে আনু ওপরে সুন্দর করে লিখল, গড ইজ গুড়। তারপর জিগ্যেস করল, কার কাছে লিখবো মা?

তোর মামার কাছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল আনু পোস্টকার্ডের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু মা কিছুই বললেন না। যখন চোখ তুলে তাকাল দেখল মা খুব ভাবছেন। মা তাকে মাথা তুলতে দেখে

একটু থতমত খেলেন যেন। তারপর পরামর্শ করার গলায় বললেন, টাকা যখন পাওয়াই গেল আনু এবার। তোর বড় আপাকে বিয়ে দিতে হয়। কত বড় হয়ে গেল। লোকে কত কী বলে, আরো বলবে এখন। তার মামাকে ডেকে আনি, কি বলিস? তুই বড় হলে আমার দুঃখ ছিল না।

মার চোখ যেন পানিতে চিকচিক করতে থাকে। আনু দেখতে চায় না। আনু চোখ নামায় আবার। মা বলেন, লেখ, পাকজোনাবেষু, আমার শত কোটি ভক্তিপূর্ণ সালাম জানিবেন ও ভাবীজানকে দিবেন।

.

সোমবারে রংপুরে গেল আনু বাবাকে দেখতে। বুলুর বাবার কাজ ছিল রংপুরে! তার সংগে গেল আনু। মা পিঠে বানিয়ে দিয়েছেন বাবার জন্যে। ছোট্ট টিফিনকারিতে ভরে সারাক্ষণ কোলে কোলে রেখে সকাল দশটার গাড়িতে চেপে বেলা দেড়টায় রংপুরে পৌঁছলো আনু। এর আগে আরো কয়েকবার এসেছিল। মাও এসছিলেন তিনবার। বড় আপা, সেজ আপা, মেজ আপাও তিনবার। সালু আপা দুবার। মিনু আপা প্রায় প্রত্যেকবার যতবার আনু এসেছে। মিনু আপা আজ আসেনি, ওর পরীক্ষা। আনু রোজ মাসে দুবার। আনু যখন জেলগেটে এলো তখন চারটেও বাজেনি। পথে খুব শস্তা বাঁধাকপি দেখে কিনেছিল একটা। মা দেখলে খুশি হবেন। মার মুখটা মনে করে ভালো লাগলো আনুর।

কত লোক এসেছে দেখা করতে। দুটো বউ এসেছে গরুর গাড়ি করে। তাদের সংগের লোকটা উবু হয়ে বসে আর তিনজনের সংগে পরামর্শ করছে। এককোণে চার পয়সার। কবিতা সুর করে করে পড়ছে আর বিক্রি করছে দুজন চোঙা লাগিয়ে। একজন পড়ছে, একজন থেমে যাচ্ছে, আবার সে পড়ছে, আগের জন দম নিচ্ছে। আর এক হাতে কপি, আরেক হাতে টিফিনকারি। মেলা লোক ভিড় করে পাঠ শুনছে। হাতখালি থাকলে আনুও গিয়ে শুনতো। চারটে বাজতে এখনো অনেক দেরি।

তারপর লাইনে গিয়ে দাঁড়াল আনু। এগুলো সব তার এখন মুখস্থ হয়ে গেছে। অফিসের এককোণে ছোটবাবুর টেবিলের কোণায় জিম্মা রাখলো কপিটা। টিফিনকারিটা দেখে দিল ওরা। ডাক পড়ল আনুর।

রোজকার মতো, বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন আনুকে। আনুর এটা অভ্যেস হয়ে গেছে। আনু বলল, পানু ভাইয়ের পাঁচ হাজার টাকা এসেছে। শুনে চমক ভাঙলো বাবার। বললেন, টাকা কোথায় রেখেছে তোর মা?

পোস্টাফিসে। মা বললেন, বড় আপার বিয়ে দেবে।

কোথায়?

জানি না। আমাকে বলেনি।

বাবা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। চারিদিকে খুব হৈচৈ হচ্ছে। সবাই দেখা করছে। নিঃশ্বাসটা তাই শুনতে পেল না আনু।

পানুটা থাকলেও ভাবনা ছিল না। তুই নিজে পছন্দ করিস আনু। তোর পছন্দ না হলে না করে দিস।

আনুর কেমন লজ্জা করতে থাকে। আবার খুশিও লাগে। বলে, আমার কথা মা শুনবে?

শুনবে। আমি চিঠি লিখে দেব। আর শোন, তোর মামাকে ডাকিস না।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে আনু। বাবা বলে চলেন, তোর মামা তোক ভালো না। নিজের ভালো দেখবে, তোদের কিছু হোক না হোক তাকাবেও না। পানুর টাকার কথা ওকে জানিয়ে কাজ নেই। তোর মায়ের সৎ-ভাই হাজার হলেও।

কিন্তু সেদিনই রাতে আনু মামার কাছে টাকার কথা লিখেছে মার জবানিতে। বাবাকে বলতে সাহস হয় না। পায়ের নখ দিয়ে মেঝে খুঁড়তে থাকে। বাবা তখন তার মাথায় হাত রেখে চুলের জট ছাড়াতে থাকেন। জিগ্যেস করেন, রংপুর এসে কিছু খাসনি?

আনু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে।

কী খেয়েছিস?

আনু জবাব দিতে পারে না। বাবা আরো হাত বুলোতে থাকেন। খামকা আনু বলে, মিনু আপার পরীক্ষা। একটুও পড়ে না।

আচ্ছা আমি লিখে দেব। পড়বে না কেন? না পড়লে কেউ বড় হতে পারে? অনেক পড়বে, পড়তে পড়তে স্কুল পাশ করবে, কলেজে যাবে, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি তারপর বিলেত। বিলেত থেকে ফিরে এসে রিসার্চ করবে, ডক্টরেট নেবে। লোকে কত ভালো বলবে। সালাম দেবে। বিদ্বানের কত সম্মান, কত প্রতিপত্তি। রাজা পর্যন্ত বিদ্বানের কাছে মাথা নত করে।

বলতে বলতে বাবার মুখচোখ দিয়ে আলো ঝরতে থাকে। যেন সুদূর দেখছেন তিনি। আনুর মাথায় হাতটাও কখন থেমে যায়। আনু টের পায়, বাবার গলা ধরে এসেছে। তার নিজেরও কেমন ছমছম করতে থাকে বুকের ভেতর। ঠিক তখন ঘণ্টা পড়ে। ঢং ঢং করে বুড়ো সেপাই ঘণ্টা বাজায়। বটগাছটা থেকে কাকগুলো হঠাৎ উড়ে গিয়ে আবার একে একে বসতে থাকে। আনু বেরিয়ে আসে। এসে বঁধাকপিটা নেয়। খালি টিফিনকারি পায়ের সঙ্গে লেগে লেগে ঢ ঢন করতে থাকে। নবাবগঞ্জে এসে গ্রামোফন–ডিলার দাশ–কোম্পানির বেঞ্চিতে জিরোয় আনু। সন্ধ্যের সময় বুলুর বাবা এখান থেকে এসে তাকে নিয়ে যাবেন। বসে বসে গান শুনতে থাকে আনু। সেজ আপা গান শিখলে গলাটা এমনি মিষ্টি হতো। লোকে কত রেকর্ড কিনে নিয়ে যেত সেজ আপার। দাশ কোম্পানির আলমিরার মাথায় বাঁধানো থাকত সেজ আপার ছবি সবার সঙ্গে।

.

আজ মাছ ধরতে যাবে আনু। দুপুরে সকাল সকাল খেয়ে চুপ করে বেরিয়ে পড়ল। হাফিজ মিয়ার পুকুরে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু যাওয়া যাবে না। হাফিজ মিয়া নিজেই কাল থেকে ছিপ ফেলছেন। পকেটে তবু মেথি দিয়ে তৈরি বড় মাছের টোপ বানানো আছে। কাল রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে মেজ আপা আর সে বানিয়েছে। মেজ আপার খুব সখ এদিকে। বাবার সাইকেলটা নিয়ে উঠোনেই সে পাক খায়। চড়তে শিখেছিল কমলগঞ্জে থাকতে। মা বলেন, গেছো মেয়ে। আনুর খুব ভালো লাগে; বুলুর বাবার দোকানে একটা ছবি ঝোলানো আছে, অনেক কটা মেমসাহেব সাইকেল চালিয়ে একসংগে সবাই ডানহাত তুলে হাসতে হাসতে যাচ্ছে।

পথে পিয়ন একটা চিঠি দিল আনুকে। পথে এরকম দেখা গেলে সে আর বাসায় যাবার কষ্ট করে না। বেঁচে যায় যেন, খুব খুশি হয়। আনু ছিপটা মাটিতে ঠেকিয়ে পোস্ট কার্ডটা তক্ষুণি পড়তে শুরু করে। পড়ে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে মাথায়। কিন্তু সেটা টের পায় না আজ। ছিপ তুলে খুব তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসে।

এসে দেখে মা জলচৌকিতে শুয়ে আছেন। তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে তোলে আনু। বলে, মামা চিঠি লিখেছে মা।

ধড়মড় করে মা উঠে বসেন। বলেন, কই? কখন?

মা পড়তে বলার আগেই আনু পড়তে শুরু করে দেয় দোয়া বহুত বহুত পর সমাচার এই যে, আয়ুস্মান আনুর হস্তাক্ষরে একখানি পত্র পাইয়া তোমার যাবৎ বিষয় অবগত হইলাম। রেল কোম্পানি নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছে ইহা একরূপ ঠকাইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। পানুর এন্তেকালে এ সংসারের যাহা ক্ষতি হইল তাহা লক্ষ টাকাতেও শোধ হইবার নহে। যাহা হউক, আল্লাহর নিকট শোকর গোজারি করিলাম যে, অন্তত কিঞ্চিত কিনারা হইয়াছে। তোমার প্রথমা কন্যার বিবাহের জন্য ভাবনা করিও না। আমি নিজ দায়িত্ব তাহা সম্পন্ন করিব। অত্র মহাকুমা সদরে একজন বি,এ, ফেল শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশীয় পাত্রের সন্ধান। আছে। আমি দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহাকে ও তাঁহার দুই একজন খাস্ দোস্ত সমভিব্যহারে তোমার বাটিতে পহুছিব। পছন্দ হইলে শুভকার্য এই যাত্রাতেই সম্পন্ন করা যাইবে। আর বিশেষ কি লিখিব? এদিকে আরেক সুযোগ হাত ছাড়া হইতেছে। বিলাতের মাতা তাহার নিষ্কর জমির তিন বিঘা মাত্র দুইশত পঁচিশ টাকা প্রতি বিঘা দরে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। আমার হাত বর্তমানে কপর্দক শুন্য। যদি সাত শত টাকা ঋণ দিতে পারো তো প্রথম বর্ষের শস্য হইতেই শোধ করিতে পারিতাম। আমি তাহাকে বহু বুঝাইয়া রাখিলাম। তুমি অর্থের জোগাড় রাখিও। শ্রেণীমত আমার দোয়া পৌঁছাইয়া দিও।

চিঠি পড়া শেষ হতেই মা বলেন, তাহলে তো বাড়িঘর দোর ঠিক করতে হয় আনু।

আনু সেদিকে কান না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, টাকা দেবে নাকি তুমি মামাকে?

মা অবাক হয়ে তাকান। আনু আবার বলল, বলো, তুমি দেবে নাকি?

তুই চেঁচাচ্ছিস কেন আনু?

হাত ধরে তাকে চৌকিতে বসাতে চেষ্টা করেন মা। কিন্তু আনু শক্ত করে চিঠিটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, তুমি টাকা দিতে পারবে না।

তার গলার স্বর শুনে আপারা এসে ঘিরে দাঁড়ায়। বড় আপা জিগ্যেস করে, কার চিঠিরে আনু?

সবার দিকে তাকিয়ে মার চেহারাটা যেন হঠাৎ বদলে যায়। দেখতে পায় আনু, যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আনু যেন ছোট হয়ে যায়। মনে হয়, ভীষণ একটা অন্যায় করে ফেলেছে সে। মা বলেন, এত যে চেঁচাস একা মামা ছাড়া তোদের আছে কে? বাপ তো জেলে, তাকে এসব দেখতেও হয় না, শুনতেও হয় না। গুষ্টি মরলে দুনিয়ায় শান্তি হতো।

চোরের মতো বেরিয়ে আসে আনু, ছিপটা লাথি মেরে সরিয়ে দেয়। ছিপটা বাইরের ছোট্ট ঘরে আড় হয়ে পড়ে ছিল। পথে এসে প্যান্টের পকেটে হাত দিতেই টোপের কৌটা ঠেকল। সেটা খুলে সব ফেলে দিল কচুবনের মধ্যে। বুলুদের বাসায় কলের গান বাজছে। সবাই যদি এক সংগে আজ মরে যেতে পারত তো মা টের পেতেন মজা। বড় আপার ওপর খুব রাগ হলো তার মাকে কিছু বলল না দেখে। অন্য দিন বকলে খুব এসে পেছনে ডাকে, আড়ালে। নিয়ে যায়। আজ সে চলে এলো, কেউ চোখ তুলে দেখলও না। বুক পকেটে পোস্টকার্ডখানা উঁকি দিচ্ছে। ভাজ করে রাখল আনু। তারপর ইস্টিশনে

গিয়ে বসলো। বেলা চারটের গাড়ি এসেছে, ইঞ্জিন ব্যাক করছে, পানি নেবে একটু পরে। উলিপুর চিলমারীর বাস এসে পৌঁছুলো। লোকগুলো দৌড়ে দৌড়ে সব টিকেট ঘরের কাছে যাচ্ছে। বুলবুল চানাচুর বিক্রি করছে, বস্তা একআনা, লালমণিরহাট থেকে ভেজে আনে। ভারী চমৎকার। আনু একটা কিনল।

৯. তিনদিন পরে রাত আটটার গাড়িতে

তিনদিন পরে রাত আটটার গাড়িতে মামা এলেন। সংগে আরো দুজন। দুজনেই প্যান্ট বুশ শার্ট পরা, একজনের হাতে সব সময় সিগারেট, আরেক জনের চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। দুজনে নিজেরা নিজেরা কি বলে আর হাসে। তার মধ্যে চশমা পরা লোকটা কম হাসে। সিগারেটওয়ালা প্রায় কাতুকুতু দেয়ার মতো করে আনুকে বগলে বগলে টানে আর খালি জিগ্যেস করে তোমার কবোন? কোন বোন বেশি আদর করে? কে ভালো গান গায়? কার চুল লম্বা? একটারও জবাব দিতে পারে না আনু। ভীষণ লজ্জা করে তাব। লোকটার গায়ে মাখনো সেন্ট, তার গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে আনুর। লোকটা নতুন সিগারেট ধরানোর জন্যে হাত ছাড়তেই আনু প্রায় ছুটে পালায়।

মামা আড়ালে ডেকে ধমকান, বেয়াদব ছেলে! মেহমানদের কথার জবাব না দিয়ে উঠে আসে! দারোগার ব্যাটা আর শিখবে কত!

তারপর গলা খাকারি দিয়ে মা যন রান্নাঘরে। সেখানে রান্নার জোগাড় করছে আপারা। আজ মেহমান বাড়িতে। মা মুরগির খাঁচা থেকে সেই দশটার সময় দুটো বের করে জবেহ্ করেছেন। পালক ছাড়ানো, দেখতে দুটো কেবল–হওয়া বাচ্চার মতো, শুয়ে আছে গামলায় গরম পানিতে। গরম মশলার খোশবু ছড়িয়েছে। মামা উবু হয়ে বসতেই মা একটা পিড়ি টেনে দিলেন, মাথায় ঘোমটা টানলেন! মামা বললেন, তোমরা একটু যাও।

আপারা উঠে যেতেই অনুচ্চ কণ্ঠে মামা হাত নেড়ে নেড়ে কী বলতে লাগলেন মাকে। আনু বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। একবার ভাবল, কাছে যায়। আবার সংকোচ হলো। বাবা বলেছেন আনুকে পছন্দ করতে। আনু তখন পায়ে পায়ে বাইরের ঘরের দিকে আসে। কিন্তু তার আগেই সেজ আপা, নে আপা, ছোট আপা, সালু আপা, মিনু আপা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। নিজেরা ঠেলাঠেলি করছে। মিনু আপা হাসতে গেছে তার মুখ চেপে ধরলো মেজ আপা।

শোবার ঘরে এসে দেখে খাটো করে রাখা হারিকেন। বড় আপা নামাজের চৌকিতে এক কোণে চুপ করে বসে আছে। তার দুহাত কোলের ওপর, যেন এখুনি উঠে যাবে। উলি না। আনুকে দেখে ম্লান হাসলো বড় আপা। বড় আপা কখনো হাসে না। হাসলে এত সুন্দর লাগে, মনে হয় নতুন মানুষ, ও যেন আনুর বড় আপাই না, অন্য কেউ, একেবারে ছবি।

বড় আপা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ হাসে। তখন আনু একটা কথাও না বলে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। একটা হাত টেনে নিল মুখের ওপর। সুন্দর চেনা চেনা গন্ধ। আনু টের পায়, বড় আপা আজ লুকিয়ে মুখে সর মেখেছে। হাতের ভেতরটা ভারী মিষ্টি হয়ে আছে তার।

পরদিন বড় আপাকে দেখল ওরা।

চশমা পরা লোকটা হচ্ছে পাত্র। আনুর খুব অস্বস্তি লাগে। বুলুর বাবা বড় আপাকে নিয়ে এসে তার মুখোমুখি বসলেন। আনু বসল তার আরেক পাশে। ভেতর থেকে এ বাড়ি ও বাড়ির সবাই তাকিয়ে রইল। সবাই মিলে আজ বড় আপাকে সাজিয়েছে। মার গয়নাগুলো পরিয়েছে। তোলা নীল শাড়িটা থেকে চামেলী আতরের গন্ধ দিচ্ছে। হাতের নখে ঠিকরে পড়ছে হ্যাঁজাকের আলো। বুলুর বাবা তার দোকান থেকে একদিনের জন্যে ধার দিয়েছেন। হ্যাঁজাকটা। শুম শুম করছে তার তেল পোড়ার শব্দ। বড় আপাকে জমিদারের বউযের মতো লাগছে। বুকের মধ্যে দুপদুপ করছে আনুর।

মামাই কথা পাড়লেন—- মেয়ে দেখতে হবে না কাশেম মিয়া। আমার ভাগনী বলে নয়, এরকম মেয়ে দুচার জেলায় হয় না। রান্না, সেলাই, নামাজ-রোজা, আদব-তমি সব কিছুতেই বরাবর কাবেল। ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সেকেণ্ড ডিভিশনে। এতদিন আমরা বিয়েশাদির কথা—- বড় মেয়ে খান্দানি পাত্র শিক্ষিত নওশা তো আর হাতের তুড়িতে আসে না।

বলেই মামা অন্দরে চোখ ঠারলেন। শেষে বললেন, সওয়াল করুন, নাশতা-পানি জুড়িয়ে যাচ্ছে। কই আক্কাস কথা কও না?

আক্কাস অর্থাৎ সিগারেট সর্বক্ষণ যার হাতে হেঁ হেঁ করে হাসল। তারপর কোল বালিশ টেনে। গলা সাফ করে জিগ্যেস করল, আপনার নাম?

ফাতেমা খাতুন।

বড় আপা একটুও ভয় পায়নি। গলা একটুও কাপল না। কেবল কেমন যেন লজ্জা জড়ানো—- তাও ভালো করে ঠাহর হয় না। বড় আপাকে এই নিয়ে আট নজন দেখে গেল। একবার এসেছিল একজন, তাকে খুব পছন্দ হয়েছিল আনুর। রায়বাজারে এক ছোট দারোগা ছিল, মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে শীস দিত আর হাঁটত বিকেল বেলায়, চিনিচম্পা কলা খেতে খুব ভালোবাসত, ঠিক তার মতো দেখতে। সকালের গাড়িতে এসে রাতের গাড়িতেই চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় আনু সংগে সংগে ইস্টিশান পর্যন্ত গেছে। অন্ধকারে হঠাৎ তাকে দেখে লোকটা ভারী লজ্জা পেয়েছিল, তার সংগে কথা বলতে ভারী ইচ্ছে করছে লোকটার। সেও ঘুর ঘুর করছে। কিন্তু কথা হয়নি। লোকটা গিয়ে আর কোনো খবর দেয় নি।

জিগ্যেসবাদ চলল অনেকক্ষণ ধরে। মামা বাইরে গেলেন, বুলুর বাবা বাইরে গেলেন, পাত্র কথা বলল বড় আপার সংগে। আনু বসে রইল সারাক্ষণ। বুলুর বাবা বাইরে গেলে বড় আপা যেন খুব ভয় পেল। ভাল করে কথা বলতে পারল না। নিঃশ্বাস যেন গলার মধ্যে আটকে রইলো। আবার যখন ওরা ফিরে এলেন, বড় আপা নড়ে চড়ে বসলো। বড় আপাকে নিয়ে ভিতরে এলো আনু। বারান্দায় বুলু খাবার সাজাচ্ছে খানচায়। মা, মেজ আপা, বুলুর মা তুলে তুলে দিচ্ছেন।

আনুর পছন্দ হয়নি। কিন্তু বলতে পারল না কাউকে। বড় আপা শোবার ঘরে গেল। তাকে সংগে যেতে হলো। বড় আপা তার আঙুল ধরে আছে শক্ত করে। ঘরে যেতেই সালু আপা, মিনু আপা, ছোট আপা, সেজ আপা ঘিরে ধরল। সবার চোখ মুখ দিয়ে খুশি

লাফিয়ে পড়ছে। গা টিপছে, হাসছে, ঢলে ঢলে পড়ছে। এমনকি বড় আপাকেও খুব খুশি লাগছে, কিন্তু দেখাচ্ছে না। আনু বলতে পারল না কাউকে। আনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল জানালার শিক ধরে, এক পা ভাঁজ করে আরেক পায়ে ঠেকিয়ে। অনেকক্ষণ বসে থেকে তার পা ধরে গেছে। বড় আপাকে বললে যেন এখুনি ডাকবাংলা, নদীর পাড়, চৌধুরীদের দালান, দুতিন মাইল বেড়িয়ে আসতে পারবে।

রান্নাঘরে আনুকে খেতে দিয়েছিলেন মা। মামা চটি চটপট করতে করতে এসে একটা মোড়া টেনে বসলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে মা জিগ্যেস করলেন, কি বলল ছেলে?

কি বলবে। সব আমার হাতে। পাকা কাজ না হলে আমি হাতই দিই না। তোমরা দুতিন গণ্ডা পাত্র দেখলে, খালি মুরগি পোলাও ধ্বংস।

অপ্রস্তুত হয়ে মা জড়সড় হয়ে বসলেন। আনুকে বললেন, আনু আর একটা গোশত দিই? আনু মাথা নাড়ল। কিন্তু নিল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন মামা! পরে গলা নামিয়ে বললেন, দাবি দাওয়া খুব বেশি। তাই সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে তোমার ভাবীকে দিয়ে কায়দা করতে হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

মা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহ্ এবার মুখ না তুললে আমার আর দিশা নেই ভাইজান।

তুলবে, বুবু তুলবে। আমি সামনের মাসেই তারিখ ফেলব, তুমি সাফ নিশ্চিন্ত থেকো। আনু, যাও তো পান নিয়ে এসো বাবা।

আনু ঢকঢক করে পানি খেল পুরো এক গেলাস। তারপর যেতে যেতে বারান্দার কাছে এসে চোখ ফিরিয়ে দেখল আর মামা ফিসফিস করে কি বলছেন। পান সে যতক্ষণ খুশি দের করে আনতে পারে, মামা রাগ করবেন না। আনু আর পান আনলো না। আনু গিয়ে রাতের রাস্তায় জোড়া সুপারি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রইল। তার পছন্দ হয়নি, এ কথা কাউকে বলা যাবে না। তার ইচ্ছে করছে বলতে, কিন্তু তাহলে বড় আপা হয়ত মুখটা আঁধার করে ফেলবে। আনু ফিরে এসে দেখল, বড় আপা শুয়ে রয়েছে। মাথার কাছে তোলা কাঁচের জগ আর পাতলা গেলাস চারটে। হয়ত ঘুমের মধ্যে হাত লেগে ভেঙে যাবে। মাথার কাছ থেকে একটা একটা করে সরিয়ে রাখল আনু।

পরদিন ভোরে মামা যাবার আগে বললেন, আনুর মা, তো আমার কি করলে?

এ প্রশ্নের জন্যেই যেন কাল থেকে বুক কাঁপছিল আনুর মার। তিনি চোরের মতো আনুকে একবার দেখলেন। আনু তখন পরম সাহসে তার ছিপ বার করে উঠোনে বসে বসে তেল খাওয়াচ্ছে। সে শুনতে পেল মা বলছে, আমার এ দুর্দিনে টাকা কোথায় ভাইজান? দারোগা সাহেবের বিপদের পর উপরে আল্লাহ্ জানে কী করে দিন যাচ্ছে এই ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

খুব গম্ভীর হয়ে শুনলেন মামা! আনু ছিপটাকে ধনুকের মতো বাকিয়ে আবার ছেড়ে দিল। চমৎকার তার হয়েছে ছিপটা। পাঁচ সাত সের পর্যন্ত ভাঙবে না।

শেষ অবধি রাহা খরচ দিতে হলো মামাকে। মামা খুব অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ি থেকে বেরোলেন। মার কথার ভালো করে জবাব দিলেন না। যাবার সময় আনুকে একবার বলেও গেলেন না। আনু আর ইস্টিশনে গেল না।

রান্নাঘরে পানি খাবার ছুতো করে এসে আনু দেখল মা সেখানেও নেই। ছাগলের বাচ্চাগুলো তরকারির খোসা চিবোচ্ছে। মা কুয়োতলায় বসে হাঁপাচ্ছেন আর গতরাতের সুরুয়া লাগা দস্তর খানা আছড়ে আছড়ে সাবানের ফেনায় সাফ করছেন। মার খুব কষ্ট হচ্ছে। মা তাকে। দেখে লজ্জা পেলেন যেন। কোনো রকমে থুপথাপ করে কাপড় রেখে হাত ধুতে ধুতে নিচু গলায় বললেন, বুলুদের হ্যাজাকটা দিয়ে আসবি?

.

পনেরো দিন ধরে মুখর হয়ে রইল বাড়ি বড় আপার বিয়ের গল্পে। মামা তো বলেই গেছেন, পছন্দ অপছন্দ তার হাতে, সামনের মাসে তারিখ দেখবেনই। মা আবার শেফালির বোঁটাগুলো রোদে বার করে শুকোচ্ছেন। বুলুর বাবাকে টাকা দিয়েছেন ঢাকা থেকে শাড়ি আনতে। বড় আপাকে দিয়ে একটা কাজও আর করিয়ে নেন না মা। একটা কিছু করতে। এলে হাত থেকে কেড়ে নেন। গাল পেড়ে সামনে যে মেয়েকে পান, বলেন, তোরা করিস কি? খালি আড্ডা আর খাওয়া। লেখাপড়া তো মাথায় উঠেছে।

বড় আপা এখন রোজ রাতে মুখে সর মাখে। সেদিন গুন গুন করে গানও গাইছিল। পরশুদিন নতুন স্যাণ্ডেল পরে আনুকে নিয়ে টাউন হলে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। বাবাকে আনু বলে এসেছিল বিয়ের কথা। বাবা জিগ্যেস করেছিলেন, তোর পছন্দ হয়েছে আনু?

উত্তরে সে মাথা কাত করে জানিয়েছে– হ্যাঁ। বাবাকেও সে বলতে পারেনি। আনুর পছন্দ হয়নি। মা তাহলে খুব কষ্ট পাবে। বড় আপা আবার ঘরের সব কাজ করতে শুরু করবে। ময়লা কাপড় পরবে, গোসল করবে সেই বিকেল বেলায়, একদিনও বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার। জন্যে আর বলবে না আনুকে।

বড় আপা চলে যাবে! আনুর খুব খারাপ লাগে। বড় আপাকে আরেকদিন নিয়ে যাবে বকশীদের বাড়িতে। বকশীদের মেয়েগুলো একদিন আনুকে বলছিল, তোর দিদির নাকি বিয়ে? একদিন নিয়ে আসবি বেড়াতে?

আনু নিয়েই যেত। বড় আপা যেতে চায় না। হাসে আর বলে, ওদের নিয়ে যা। কিন্তু অন্য কোনো আপাকে নিয়ে বেড়াতে ভালো লাগে না আনুর। তার উৎসাহে যেন পানি পড়ে।

.

আয়নার মতো নিজেকে দেখা যাচ্ছে নদী থেকে একটু দূরে খালের পানিতে। আনু ছিপ হাতে নিয়ে ভাবে, বেলে মাছ পেলে বড় আপা খুব খুশি হতো। বেলে মাছ কী মিষ্টি, নারে? বড় আপা বলবে আর খাবে।

ইস ইস। ছিপ ধরে প্রচণ্ড টান দেয় আনু। কয়েকটা পচা পানা এসে ঠেকেছে। একটা দোলা দিয়ে বড়শিটাকে বাঁ হাত দিয়ে কাছে আনে, তারপর পানা ছাড়িয়ে নতুন একটা পোনামাছ গেথে টুপ করে আবার পানিতে ফেলে দেয়। ভাসতে ভাসতে ফানাটা স্থির হয়ে আসে। আনু আস্তে আস্তে তখন কাঁধ নামিয়ে দুহাঁটুর মাঝখানে ছিপটা রেখে বসে। ঝোঁপের মধ্যে কোথাও একটা পাখি ডাকতে থাকে তা টুক টুক, তা টুক টুক।

বাবাকে বললেও হতো। বাবাকে বললে, বাবা খুব শক্ত চিঠি লিখে দিতেন মাকে। মিনু আপাটা পড়ে না কেন? আমি বলতে যাবো। আমি বললেও পারতাম বাবাকে। বাবা আমাকে বললেন, তোর মামা টাকা চেয়েছিল নাকি রে? আমি তখন মাথা নেড়ে চোখে মুখে বললাম, না, না। মা যদি মামাকে টাকা দিত, কি বলতাম বাবাকে? আমার একটুও পছন্দ হয়নি। বাবাকে বললেও হতো। বললে, চিঠি লিখে দিতেন। বাবাকে বললাম না কেন?

কোল থেকে খরখর করে নেমে যাচ্ছিল ছিপটা। দুহাতে আঁকড়ে ধরে পড়ি পড়ি করে উঠে দাঁড়াল আনু। দুতিন পা এগিয়ে একেবারে পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে আড় করে একবার টানলো। স্রোতের উলটো দিকে টানছে। কি? আবার একটু ডানদিকে ফেরালো ছিপটা। ছিপ এলো, বড়শি রয়ে গেছে সেখানেই। মাছটা নড়ছে না। চুপ করে দম নিচ্ছে বুঝি।

বড় কই হবে। কই না। কই হলে গোঁত্তা মারত হঠাৎ। একবার ডানে, একবার বামে কয়েকবার দুলিয়ে হু-উ-স করে ডাঙায় তুলে ফেলল ছিল্। সংগে সংগে গোড়ালির ওপর ঘুরে আকাশ পানে হা করে তাকিয়ে দুলতে দুলতে আনু দেখে রূপোর করনির মতো ফলি মাছটা দাপাচ্ছে, ভাজ হচ্ছে আবার সোজা হচ্ছে। পিঠের ওপর আটকেছে বড়শি। খানিকটা ছাল শুধু ধূসর মাংস ছিলে উলটে গেছে। খুব লেগেছে মাছটার। বড়শিটা গিললে কষ্টই পেতি না। নিচে দিয়ে। যাচ্ছিলি কেন? খুব সাবধানে খুলে আনে আনু। নিচে দিয়ে যাবার সময় বাঁকা হয়ে জোরে ভেসে উঠেছিল, তখন গেঁথেছে।

পেট থেকে আতুরি বার করে ছুরিটা পকেটে রাখে আনু। তারপর একটা গর্ত বানায়, গর্তটা আপনা আপনি ভরে ওঠে পানিতে। কতগুলো ঘাস ছিঁড়ে বিছিয়ে মাছটাকে সেখানে রাখে আনু। একটা বড় নৌকা নদী থেকে তাঁদের মধ্যে ঢোকে—- পলাশ বাড়ির হাট আছে। কালকে। আরো কয়েকটা নৌকা গেছে।

একটা বেলে পেলে হতো। ছোট্ট, এই আধ হাত মতো হলেও হয়। বেলে কেউ পছন্দ করে না। কেবল সে আর বড় আপা। আবার ছিপ ফেলে আনু। বাবাকে বললেও পারতাম। বাবাকে বললাম না কেন?

বুলু ভাইকে বললেও হতো। বুলু ভাইকে বললাম, আসতে, এলো না। সালু আপার সংগে ক্যারম খেলছে দুপুর থেকে। মা ঘুমিয়ে কি, নইলে দিত এক বকুনি। দিতাম যদি মাকে ডেকে।

অনেকক্ষণ কিছু ওঠে না। ছিপ উঠিয়ে আনে আনু। টোপ বদলায় অনেকক্ষণ ধরে। একটা তাজা পোনা লাগায়। লাগিয়ে আবার ফেলে। ফেলে চুপচাপ বসে থাকে। নৌকাটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

মামাকে যদি টাকা দিতেন মা? ইস্, দেবে কী আমি তাহলে বাবাকে বলে দিতাম। মা একটা বোকা। মা খুব বোকা। মা কিস্সু বোঝে না। বাবাকে বললাম না কেন? আমি একটা বোকা। আমি খুব বোকা। আমি বোকা। শুনলে, বাবা রাগ করবেন। বাবাকে বললাম না কেন?

আস্তে আস্তে বেলা পড়তে থাকে। পেছনে বাজপড়া তাল গাছটায় কাক বসে আছে। কা কা করছে। একটা ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে ছিপ নড়ে গেল। যাকগে। আমি খুব বোকা। কাকটা উড়ে গেল।

বাবাকে বলব। আবার যখন দেখতে যাবো বাবাকে, বলব। বলব, আমার পছন্দ হয়নি। বলব, মামা টাকা চেয়েছিল। আমি খুব চেঁচামেচি করেছিলাম কিনা, তাই মা টাকা দেয়নি। আমি অমন না করলে, দিত টাকা মামাকে। মামা সব টাকা নিয়ে যেত। বাবাকে বলব। আমি ভারী বোকা। বাবাকে সব বলব। আবার যখন দেখা করতে যাবো, প্রথমেই বলব।

ছিপ তুলে আনে আনু। পশ্চিম দিকে আকাশ লাল হয়ে এসেছে। মা এতক্ষণে উঠোন ঝাড় দিয়ে ওজু করতে বসেছেন। ছোট আপারা বেণী করছে বারান্দায় বসে বসে। বড়

আপার জন্যে বেলে মাছ একটা পেলে হতো। বেলে মাছের জন্যে কাল পুলের নিচে যাবে আনু। সেখানে একবার দশটা পেয়েছিল আনু। পকেট থেকে সুতা বের করে ফলি মাছটার ঠোঁটে গেঁথে হাতে ঝুলিয়ে নিল সে। আরেক হাতে কাঁধের পরে ফেলল ছিপটাকে। খালের পানি সুন্দর কুলকুল করছে। যেন যেতে দিতে চায় না। আজ রেল লাইন ধরে ধরে বাসায় যাবে আনু। হোক সন্ধ্যে মা বকুক। মা কি জানে? মা কিসসু জানে না। মা একটা বোকা। মা খুব বোকা। মা যদি বোকা না হতো, আনু একটুও দুঃখ পেত না।

আনু বাসার উঠোনে এসে দাঁড়ায়। ছিপটাকে বারান্দায় রাখে ঠেস দিয়ে। মা নামাজ পড়ছেন। মাছটা দেয় সেজ আপার হাতে। ওরা অবাক হয় এতবড় মাছ দেখে। আনু একটুও হয় না। আনু হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসে। নামাজ থেকে উঠে এসে মাছ দেখে মা তাকে বকুক না। সে মন খারাপ করবে না, শুয়ে পড়বে না, ইস্টিশনে যাবে না, রাস্তায় গিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে না। আনু এখন পড়বে। আনু পড়তে শুরু করে। আনু বই নিয়ে পড়তে ব্রু করে। আনু ইংরেজি বই থেকে দাগানো শব্দগুলোর মানে মুখস্থ করে মনে মনে। ছমাস। থেকে কিসসু পড়া হয়নি।

যেন আজ নিজেও জানে, আনু বড় হয়ে গেছে।

১০. গীর্জার পুকুরটা ঘন গাছপালায় ঘেরা

গীর্জার পুকুরটা ঘন গাছপালায় ঘেরা-ঢাকা, নির্জন, কেমন গা ছমছম করে, দুপুর বেলাতেও সন্ধ্যের মতো মনে হয়। মনে হয়, এক্ষুণি রাত হয়ে যাবে। কিন্তু ভয় করে না আনুর। ভাঙা ঘাটে শেষ ধাপে বসে ছিপটা ফেলে তাকিয়ে থাকে সবুজ পানির দিকে। এখানে এর আগে কোনদিন আসেনি সে। সেদিন বুলু ভাইদের বাড়িতে রাজমিস্ত্রীর কাজ হচ্ছিল, মিস্ত্রী বলেছে গীর্জার পুকুরের কথা।

রাস্তা থেকে প্রথমে চোখে পড়ে বড় আটচালা লম্বা টিনের ঘরটা। এর একদিকে লাইব্রেরী, বিনি পয়সায় ছোট ছোট বই দেয় পাদ্রীরা, আবার যতক্ষণ খুশি বসে বসে পড়ো ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ, কেউ কিছু বলবে না। লাইব্রেরীর পাশে গীর্জা-ঘর। এই ঘরটার দক্ষিণে তিনটে টিনের বড় বড় ঘর। এখানে স্কুল। মাদার সর্বজয়া গার্লস স্কুল। মিশন থেকে স্কুলটা করে দিয়েছে। স্কুলের পেছনে থাকেন হেড মিসট্রেস জিনি সিসটার। পুরো নামটা শোনেনি আনু। এ নামেই সারা শহরে সবাই চেনে। সকাল বেলায় মেয়েরা দল বেঁধে হেঁটে হেঁটে স্কুলে আসে। মিনু আপা সালু আপা পড়ত এই স্কুলে। বাসা বদলের পর সেই যে কদিন কামাই দিল, আর যায় না ওরা। কেউ আর যেতে বলে না ওদের। বাসায় যখন ইচ্ছে হয়, বই নিয়ে বসে।

ফাৎনার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কেমন সব ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সালু আপা ভারী আড্ডাবাজ হয়েছে। খালি ক্যারম খেলবে বুলু ভাইদের বাসায় গিয়ে। বাবার মুখ মনে পড়ে যায় আনুর। বাবাকে গিয়ে এবার বলবে। সেজ আপাকে বলবে,

একটা দরখাস্ত করে দিতে ফুল ফ্রি-র জন্যে। ফুল ফ্রি হয়ে গেলে আবার মিনু আপা সালু আপা স্কুলে যেতে পারবে। ওদের জামাগুলো পুরনো হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে। একটা পাখি না পোকা কোথা থেকে তখন থেকে কিট কিট করে ডাকছে।

এইসব মুহূর্তে আনু একেবারে একা হয়ে যায়। চারদিকে কেউ নেই, কোথা থেকে বিচিত্র সব শব্দ উঠছে, ফাৎনাটা স্থির হয়ে আছে। মনে হয় আনুর ঘর নেই, বাড়ি নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, তার কেউ নেই। সে কোনদিন বড় হবে না, মহিমপুর ছেড়ে কোথাও যাবে না। মনে হয় সব স্থির হয়ে গেছে।

একটা ঢিল এসে লাগে তার পিঠে। চমকে ওঠে আনু। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায়। কি ব্যাপার? গীর্জা ঘর, স্কুল, জিনি সিস্টারের কোয়ার্টার সব দেখা যাচ্ছে দূরে, সেখানে কেউ নেই। আশেপাশে একেবারে ফাঁকা। গাছের ওপরেও কিছু চোখে পড়ল না আনুর। তাহলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মারলো কে?

কিসসু বুঝতে না পেরে বোকা হয়ে গেল আনু। তারপর আবার বসলো ছিপ নিয়ে। কিন্তু মনটা তার খুঁতখুঁত করতে লাগলো। এ সব নির্জন জায়গায় কত রকম কী আছে! আনু শুনেছিল, অনেকদিন আগে এক পাদ্রী আত্মহত্যা করেছিল। জোছনা রাতে তাকে নাকি এখনো দেখা যায় গীর্জা-ঘরে হাঁটতে, পুকুর পাড়ে বসে থাকতে, আবার তকতকে উঠোনে নাকি মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আনুর সঙ্গে একটা খ্রিষ্টান ছেলে পড়ত পিটার পল দাস। সেই পিটার বলেছে, তার বাবা নাকি নিজের চোখে দেখেছে।

আনুর গা ছমছম করে ওঠে। কি জানি, সেই পাদ্রী ভূতটা না তো! এখন আরেকটা ঢিল এসে পায়ের কাছে লাগে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে, পিন্টু : ফিচ ফিচ করে হাসছে বুড়ো জারুল গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে। আনু অবাক হয়ে গেল। পিন্টু। গলা তুলে ডাকতে সাহস পেল না, পাছে গীর্জার লোকেরা টের পেয়ে যায়। এমনিতে সে চুরি করে মাছ ধরতে বসেছে। জিনি সিস্টার ভারী কড়া। ধরতে পারলে শাস্তি দেবেন। আনু তাই নিঃশব্দে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো পিন্টুর দিকে। সে এখন এক পা এক পা করে কাছে এগিয়ে এলো।

মাছ ধরছিস?

আনু জবাব দেয় না। পিন্টু আবার বলে, এঃ, একটাও ধরতে পারিস নি।

আনু ফাৎনার দিকে তাকিয়ে থাকে। পিন্টুর সাথে তার সেই প্রথম দিনের ঝগড়ার পর মুখে ভাব হয়ে গেলেও মনে মনে কিছুতেই আনু ওকে ভালো চোখে দেখতে পারে নি। সারাক্ষণ এমন সব বিচ্ছিরি কথা বলতে থাকে আর ইশারা করে যে আনুর চোখ কান লাল হয়ে যায়। পিন্টু এখন বলে, বলে দেব তুই মাছ ধরছিস?

যা বলগে। বল না?

পিন্টু কী ভাবে। তার গা ঘেঁসে বসে আরো। খুব উদার একটা ভঙ্গিতে ঘাটে কাৎ হয়ে শুয়ে বলে, যা, বলবো না।

হাতটা আলগোছে ধরে পিন্টু। আনু ছাড়িয়ে নেয়। ফাটা বুঝি নড়ে ওঠে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলে আনু দূর, কিছু না। আজ আনুর বরাতটাই খারাপ। বাজে কথা বলেছে। ফাঁকি দিয়েছে। তারচেয়ে টোগরাই হাট পুলের নিচে গিয়ে বসলে ঢের মাছ ধরতে পারত আনু। পিন্টু পকেট থেকে সিগারেট বার করে, আর দেশলাই। আনু অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, তুই সিগ্রেট খাস?

এবারে পিন্টু চুপ করে থাকে। ঠোঁটের ফাঁকে তেরছা হাসি ফুটিয়ে সিগারেটটা নেড়ে দেখে। তারপর পুরো চিৎ হয়ে শুয়ে ঠোঁটে গুঁজে দেয়। দেশলাই জ্বালায়। একমুখ ধোঁয়ার আড়ালে পিন্টুর মুখ ঢেকে যায়। কেমন অদ্ভুত দেখায়। গা শিরশির করে ওঠে আনুর। পিন্টু বলে, খাই তো। সিগারেট না টানলে কেউ বড় হয় না।

তোর বাবা কিছু বলে না?

বাবা জানেই না। চালের বাতায় খুঁজে রাখি, ভাত খেয়ে পায়খানায় বসে খাই। জানবে কি করে? বুদ্ধি থাকা চাই।

তখন ভীষণ ভয় করে আনুর। এখন যদি কেউ দেখে ফেলে। তাহলে সবাই ভাববে, আনুও সিগারেট খায়। সে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। পিন্টু কোথা থেকে এলো শয়তানের মতো? যায়ও না ছেলেটা। আনু ছিপ তুলে নেয়, গুটিয়ে ফেলে সব। পিন্টু খপ করে তার হাত ধরে ফেলে।

কোথায় যাচ্ছিস?

হাত ছাড়।

আগে বল, কোথায় যাচ্ছিস?

বাসায়।

একটু বোস না ভাই।

পিন্টু হঠাৎ নরোম গলায় বলে উঠে বসে। আনু কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে বসে। বলে, তাহলে তুই সিগারেট খেতে পারবি না।

দূর, ভয় কিরে? এখানে কে দেখছে?

না দেখুক। আমার ভালো লাগে না।

তুই খাবি একটা?

ফস্ করে পকেট থেকে সিগারেট বার করে পিন্টু। কিছু বলার আগেই আনুর হাতে খুঁজে দেয়।

খা না। কে দেখবে?

না, কক্ষনো না।

তুই গাধা। খেলে বুঝতি কী মজা। খা না। দ্যাখ, এইরকম করে টান দিবি, কিছু লাগবে না। বলতে বলতে পিন্টু টান দিয়ে দেখায়। তারপর নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে। তুই কিন্তু প্রথমে নাক দিয়ে আমার মতো ছাড়তে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবি। প্রথমে গিলবি না। টানবি আর ধোঁয়া ছাড়বি। ধর।

এক ধাক্কা দিয়ে তার হাত সরিয়ে দেয় আনু। হাতটা শানের ওপর গিয়ে পড়ে। ব্যথা লাগে পিন্টুর। লাফ দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, এঃ সাধু মহারাজ। ঘুসখোরের ব্যাটা, তার ফুটানি কত!

মাথার ভেতরে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল আনুর। একটা প্রচণ্ড ঘুষি সে বসিয়ে দিল পিন্টুর মুখে। পিন্টু মুখ দুহাতে ঢেকে বসে পড়ল। তারপর যখন তাকাল তার চোখ লাল হয়ে গেছে, পানি ভরে এসেছে। সে প্রথমেই এক কাণ্ড করল। আনুর পড়ে থাকা ছিপটা দুহাতে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পুকুরে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আনুর ওপর।

ইয়াসিনের কাছে কুস্তি শিখেছিল আনু। এখনো মনে আছে তার। চট করে সে সরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল পিন্টু। তারপর দুজন দুজনকে ধরলো জাপটে। হাতে পায়ে লাথি মেরে ঘুষি দিয়ে গড়াতে গড়াতে শান বাঁধানো ঘাট পর্যন্ত চলে গেল ওরা। পিন্টুর গায়ে জোর কম না। আনু কিছুতেই আর সুবিধে করতে পারছে না। তার হাতটা বেকায়দায় পড়েছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, কোথায় যেন নোখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে পিন্টু, পুড়ে যাবার মতো জ্বালা করছে। হঠাৎ পিন্টু তার মাথাটা ধরে আছড়ে দিল শানের ওপর। বিকট আর্তনাদ করে উঠল আনু। পায়ের শব্দে লাফ দিয়ে পালাল পিন্টু।

কে, কারা, কে ওখানে?

একটা মাঝবয়সী দারোয়ান ছুটে এলো। আর তার পেছনে জিনি সিস্টার স্বয়ং। আনু উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে রক্ত।

রক্ত! জিনি সিস্টারকে দেখে আনু বড় বড় করে বলে ওঠে, আমার দোষ নেই। আমাকে মেরে পালিয়েছে। সিগারেট খেতে বলে।

তারপর মাথাটা কেমন ঝিম দিয়ে আসে আনুর। চোখের সামনে জিনি সিস্টার, দারোয়ান, গীর্জা ঘরের চকচকে টিনের চাল—-সব দুলে ওঠে। তারপর আঁধার হয়ে যায়। সে বিড়বিড় করে বলে, রক্ত! বহুদূর থেকে ভেসে আসা কথার মতো সে শুনতে পায় জিনি সিস্টার বলছেন, ওকে ধর, পড়ে যাচ্ছে। ঘরে নিয়ে আয়।

চোখ মেলে দেখে জিনি সিস্টার সামনে বসে আছে। হাতে তার গরম দুধের গেলাশ। দেয়ালে মা-মেরীর ছবি। হাত দিয়ে দেখে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ। উঠে বসতে চায় আনু। তিনি তাকে শুইয়ে দিয়ে বলেন, আরো একটু শুয়ে থাকো খোকা। কিছু হয়নি তোমার।

আনু আবার শুয়ে পড়ে। কেমন একটা অবসাদ সারা শরীরে, আর আনু কিছু না। দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় সব—- পিন্টুর আসা, সিগারেট খাওয়া, মারামারি। ছিপটার জন্যে মন কেমন করে ওঠে। কত যত্ন করে বানিয়ে ছিল আনু। ভীষণ লজ্জা করতে থাকে তার। চুরি করে মাছ ধরতে এসে এইভাবে ধরা পড়ে গেল। আর সে কি ধরা পড়া! একেবারে জিনি সিস্টারের হাতে। চোখে তার পানি এসে যায়। পিন্টু তার বাবাকে ও ভাবে গাল দিতে গেল কেন? এর পরে আবার কোনদিন বললে আছড়ে মানুষ করে দেবে পিন্টুকে। আজ নেহাৎ তার হাতটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল বলে।

চেয়ারে বসে আছেন জিনি সিস্টার। এই প্রথম তাকে এত কাছে থেকে দেখল আনু। অনেকটা মনিরের মা-র সমান। কিন্তু ছিপছিপে শ্যামল, গায়ে একটা গয়না নেই শুধু গলায় রূপোর চেনে স্কুশের লকেট, হাতে ঘড়ি, কালো চিকন পাড়ের শাদা শাড়ি পরনে। চোখের চশমার জন্যে ভারী গম্ভীর দেখাচ্ছে। কিন্তু কথাগুলো কী মিষ্টি। তার বড় আপার মতো মায়া করে কথা বলেন। আনু চোখ বুজে থাকে। আবার যখন চোখ খোলে তখন জিনি সিস্টার গেলাশটা এগিয়ে বলেন, খেয়ে নাও দিকি।

লজ্জা করে আনুর, কিন্তু উঠে বসে চো চো করে সবটা খেয়ে ফেলে। কেন যেন চোখে পানি এসে যায় তার। জিনি সিসটার জিগ্যেস করেন, কি নাম তোমার?

আনু।

কোন্ বাড়ির ছেলে তুমি?

কী বলবে আনু? বাবার নাম করতে সংকোচ হয়। আৰু কী দিয়ে সে পরিচয় দেবে নিজের বুদ্ধি করে শেষে বলে, আমার বোন পড়ত এই ইস্কুলে।

কে?

নাম করলো আনু। তখন ছোট্ট করে জিনি সিস্টার উচ্চারণ করলেন, ও।

অনেকক্ষণ আর কিছু বললেন না। অস্বস্তি করতে লাগল আনুর। ঝি এসে গেলাশ নিয়ে গেল। আনু মাথা নিচু করে রইলো। শেষে সে নিজেই বলল, পিন্টু, বশীদের ছেলে, চেনেন? আমাকে সিগারেট খেতে বলে। খারাপ কথা বলে। আমি ঘাটে চুপচাপ বসেছিলাম। আমি কিসসু করিনি।

জিনি সিস্টার হাসেন। আনু বুঝতে পারে ঘাটে চুপ করে বসে থাকার মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেছে। সে সেটা ঢাকার জন্যে আবার বলে, আমার মাথা কেটেছে নাকি?

না। একটু কেটে গেছে। ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। খারাপ ছেলের সঙ্গে কক্ষনো মিশো না। তুমি পড়ো?

হ্যাঁ, ফাইভে। এবার সিক্সে উঠব।

বাঃ, বেশ। তুমি এতো ভালো ছেলে, দুপুর বেলায় মাছ ধরতে বেরোও কেন? এখন লেখা পড়া করবার সময়।

চোখ নামিয়ে নেয় আনু। জিনি সিস্টারকে তার ভালো লাগে। ভয় করে না আর। তাই ভয় পায় না কথা শুনে। উনি তো জেনেই গেছেন আনু মাছ ধরতে এসেছিল। বলে, রোজ ধরি না। আমি পড়ি। ফোর থেকে সেকেণ্ড হয়ে ফাইভে উঠেছি।

এবার কি হবে?

কী জানি। আমার দুটো বই নেই।

মা-কে বোলো কিনে দিতে। তোমরা কভাই বোন?

পাঁচ বোন আর আমি। বড় ভাই ছিল, রেলে কাটা পড়ে মারা গেছে।

হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

তখন আরো আপন মনে হয় তার জিনি সিস্টারকে। বলে, এখানে কত ফুল গাছ। আমি বাগান করেছিলাম, একটা ভালো গাছ পাই না।

তুমি বাগানও করো? আচ্ছা, তোমাকে আমি চারা দেব। কাল এসো। এক যেতে পারবে?

হ্যাঁ

মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত বুলোতে বুলোতে আনু বলে। কিন্তু উনি উদ্বিগ্ন গলায় বলেন, তোমার মা দেখলে কি বলবেন? তোমাকে দিয়ে আসুক। এখন ভালো লাগছে না একটু?

আনু মাথা কাৎ করে সায় দেয়। জিনি সিস্টার দারোয়ানকে ডাকেন। আনু উঠে দাঁড়ায়।

আজ একটা মাছ ধরতে পারেনি সে, ছিপটা গেছে। মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছে, তবু একটুও মন খারাপ করে না আনুর। যেন ভারী আশ্চর্য কিছু পেয়ে গেছে সে আজ। খুব বাহাদুর মনে হয় নিজেকে, ভিতরটা ফুরফুর করে ওঠে।

সুবিনয়, যা তো বাবা, একে বাসায় দিয়ে আয়

আনু বাইরে আসে। আকাশটা লাল হয়ে গেছে। তকতকে উঠোনটা আরো বড় দেখাচ্ছে। লাইব্রেরী ঘরে লোকেরা বসে বই পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে। কয়েকটা মেয়ে ধপধপে ধোঁয়া কাপড় পরে, চুল টানটান করে বেঁধে গীর্জা ঘর ঝাড় দিচ্ছে। আবার কয়েকজন বাগানে পানি দিচ্ছে। ঠাণ্ডা ঝিরঝির বাতাস বইছে উত্তর থেকে। ফুল গাছগুলো ছবির মতো আঁকা হয়ে আছে যেন। টিনের বড় গেটটা পর্যন্ত এলেন জিনি সিস্টার। হঠাৎ বললেন, শোনো, তোমার বোনদের স্কুলে আসতে বোলো কাল থেকে। মা-কে বোলো আমি ফ্রি করে দেব। বোলো, জিনি সিস্টার বলে দিয়েছে। কেমন?

কাল আমাকে চারা দেবেন। আমি আসবো?

আচ্ছা, এসো।

বাড়ির দরোজায় মেজ আপার সঙ্গে দেখা। দরোজা ভেজিয়ে রাস্তা দেখছিলেন গাল পেতে। সুবিনয়ের সঙ্গে আনুকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি।

এ-কী? তোর কি হয়েছে আনু?

কিছু না। ফুটবল খেলতে গিয়ে—-

হঠাৎ তার খেয়াল হয় সুবিনয় পাশে দাঁড়িয়ে : সে তাকে বললো, তুমি যাও দারোয়ান। এটা আমার বাসা।

সে চলে গেলে আনু সোৎসাহে বলতে থাকে, ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল। জিনি সিস্টার, সর্বজয়া স্কুলের বড়দিমনি, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। সালু আপা আর মিনু আপার ফুল ফ্রি করে দেবে বলছে, আমাকে ফুলের চারা দেবে, দেখো।

এসব কিছুই শোনেন না মেজ আপা। তার মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত রেখে বলেন, শীগগীর চল তুই ভেতরে। মা দেখলে! ইস্, এত দুষ্ট হয়েছিস তুই।

আনুর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সে বলে, যাও, যাও। মা কী বলবে? আমি ইচ্ছে করে মাথা ফাটিয়েছি, না? আর ওদের ফুল ফ্রি হয়ে গেল, সেটা কী? আমাকে বকবে, এঃ।

.

তারপর থেকে এমন হলো প্রায় রোজ যেত জিনি সিসটারের কাছে আনু। ফুলের চারা এনে লাগিয়েছে সে। গোলাপের দুটো কলমও এনেছে। বারান্দার পাশে আনুর বাগানটা এখন কী সুন্দর হয়েছে। গোলাপ যেদিন ধরবে সেদিন হবে আসল মজা। সেদিন একটা ফুল চুরি করে সেজ আপা খোঁপায় দিয়েছিল, আনু কী রাগ করলো। মা বললেন, একরকম করলে তোর সব গাছ আমি কেটে ফেলব। মানুষ হয়েছে না জানোয়ার হয়েছে একটা।

আজকাল কী হয়েছে, কথায় কথায় মা বিরক্ত হয়ে ওঠেন, চাঁচাতে থাকেন, গাল পাড়েন। সারাক্ষণ মুখটা কালো হয়ে থাকে। আনু কিসসু ভেবে পায় না। এ রকম হয়ে গেছেন কেন উনি? তার খুব রাগ হয় একেক সময়। মার সঙ্গে কথাই বলে না সে সারাদিন। আবার রাতে এসে মাথার কাছে বসেন। আস্তে আস্তে ডাকেন, ওঠ, বাবা আমার। ভাত খাবি না?

তখন আর কিসসু মনে থাকে না আনুর। তখন সে আবার আগের মতো হয়ে যায়। মার হাত জড়িয়ে ধরে আরো কিছুক্ষণ পড়ে থাকে। মা বলেন, তুই রোজ ভাত না খেয়ে ঘুমোলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। ওঠ। কাল থেকে সন্ধ্যার সময় ভাত বেঁধে দেব। ওঠ আনু।

সালু আপা মিনু আপা আবার স্কুলে যায়। ওদের একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। বাবাকে গিয়ে যখন সেদিন আনু বলল ওরা আবার স্কুলে যাচ্ছে, কী খুশি হলেন তিনি। লেখাপড়ার কথা শুনলে, এত খুশি হন বাবা। মুখটা সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করে ওঠে। আনু আরো ভালো করে লেখাপড়া করবে। এবার যদি সে ফার্স্ট হতে পারে তো স্কা একটা কাণ্ড হয়। বাবা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। তখন আনু তাকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখাবে। বলবে, বৃত্তি পরীক্ষা দেবে। বৃত্তি পেলে কত ভালো হয়। এক পয়সা লাগবে না পড়তে, আবার মাস মাস ছটাকা করে পাবে। ছটাকায় কত কী করা যায়। আনু একজোড়া স্যাণ্ডেল কিনবে। খালি পায়ে তার এত লজ্জা করে স্কুলে। কিন্তু কোনদিন সে কথা বাসায় বলে না। সে তো বোঝে, কী কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন মা। পানু ভাইর জন্যে টাকা দিল রেল কোম্পানি। সেই টাকা দিয়ে আপাদের বিয়ে দেবার কথা।

তা থেকেও এখন পাঁচ টাকা দশ টাকা করে কমছে। এদিকে মামা প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখছেন টাকা চেয়ে। আজকাল মামার চিঠি মা পড়েনও না, জবাবও দেন না। মামার ওপরে ভীষণ রাগ হয় আনুর। তারচেয়ে মনিরের বাবা অনেক ভালো। রোজার ঈদে একশ টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মা যেন কেমন! টাকা সই করে রাখলেন কিন্তু কদিন ধরে বারবার বলতে লাগলেন, না নিলেই হতো। এখন বড়লোকী দেখাচ্ছে।

সেই টাকা দিয়ে ঈদে নতুন জামা হলো। আনু একাই নামাজ পড়তে গিয়েছিল মাঠে। বাবা থাকতে ভোর বেলায় তোপ পড়বার আগে, অনেক আগে আনুকে নিয়ে মাঠে হাজির হতেন। বসতেন একেবারে প্রথম সারিতে। হাফেজ সাহেবের ঠিক পেছনে। তারপর একটা তোপ পড়তো, তার আধঘন্টা পরে আবার একটা। আবার যখন পড়তো, তখন সবাই কাতার বেঁধে দাঁড়াত। লোকেরা দৌড়ে দৌড়ে পুকুর থেকে ঝপাঝপ ওজু করে আসতো। গরিবদের জন্যে কাগজের রঙ্গিন টুপি বিক্রি হতো একআনা করে; সেই টুপি কিনবার জন্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেত। জং পড়া পানির খালি ট্যাঙ্কে কাক ডাকতো কা–কা করে। হাফেজ সাহেব পাগড়ি পরে সামনে এসে দাঁড়াতেন তখন। একটি লোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নামাজের নিয়ত বলে দিত। আবার বলত, যারা মনে রাখতে পারবেন না, তারা বলবেন, ইমামের যে নিয়ত আমারো সেই নিয়ত, আল্লাহ আকবর। যা হাসি পেত শুনে আনুর।

এবার একা গিয়ে সে সবার আগে বসেছিল। কিন্তু কারা এলেন, তাকে পাশে সরতে বলল। সেখান থেকেও শেষ পন্ত ঠেলাঠেলি করে তাকে পেছনের কাতারে ঠেলে দিল। কে ঠেলল, কখন ঠেলল, কিছুই জানে না। যখন সবাই কাতার ঠিক করবার জন্যে

দাঁড়িয়েছে তখন আনু দেখে সে পেছনে পড়ে গেছে। চোখে পানি এসে গিয়েছিল তার। সামনে যারা দাঁড়িয়েছে। সবার ওপরে রাগ হচ্ছিল ভীষণ। সে ছোট বলে, কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। সে একা বলে, কেউ তাকে তোয়াক্কা করে না। বাবার কথা এত মনে হলো তার। কোথা দিয়ে নামাজ শেষ হয়ে গেল, কিসসু বলতে পারবে না আনু, সারাক্ষণ বাবার কথা মনে পড়ছিল আর বুক ঠেলে ঠেলে কান্না উঠছিল। নামাজ শেষে আনু দেখে চোখে কিছুই দেখতে পারছে না সে। খালি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সব।

বাসায় এসেই আবার ছুট ইস্টিশানে। মা টিফিনকারীতে সেমাই, পোলাও, গোশত দিয়ে দিয়েছেন। বড় আপা, মেজ আপা আর সেজ আপা তাকে মোট দুটাকা আর মা দুটাকা দিয়েছেন। বুলু ভাই এসে বারবার বলছে, চল, চল, গাড়ি ফেল করবি।

বুলু ভাই ঈদের দিন বেড়াতে যাচ্ছে রংপুর। সিনেমা দেখবে। আনু যাচ্ছে বাবাকে দেখতে। এর মধ্যে দাঁড়িয়েই সেমাই খেতে হলো বুলু ভাইকে। তার একমুহূর্ত সময় নেই। সালু আপা পানি দিতে গিয়ে অর্ধেক গায়ে ফেলে দিল তার। বুলু ভাই লাফিয়ে উঠলেন, এহেহে। দিল তো আমার জামা ভিজিয়ে। মারবো একটা।

গা দিয়ে ফুরফুরে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে এসে বুলু ভাই বলে, দাঁড়া আনু, আগে তোর সাথে কোলাকুলি করে নি।

সেদিন বাবার সঙ্গে পাঁচ মিনিটেই দেখা হয়ে গেল। অন্যদিন কত ঝামেলা, আজ ঈদের দিন কিনা, তাই চারদিকে কেমন আনন্দ আর দিল খোলর দরিয়া বয়ে যাচ্ছে। রঙিন

জামাকাপড় পরে কত যে লোক এসেছে দেখা করতে। ভিড়ে যেন আর ঠাই হচ্ছে না। কলের গান বাজছে তারস্বরে, দূরে রেস্তোয়। পথের মোড়ে বাদর নাচের ডুগডুগি বাজছে। ঈদের স্পেশাল শো–এর ব্যাপার্টি বেরিয়েছে সিনেমার পোস্টার ঘাড়ে করে। সই সই গাড়ি মোটর রিকশা ছুটে চলেছে। সারা পৃথিবী যেন একতারে অনর্গল খলখল করে হাসছে। রোদ উঠেছে খুব। বাবা দেখা হতেই তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে চুমো খেলেন। জিগ্যেস করলেন, কিরে নামাজ পড়েছিস?

হ্যাঁ।

এই জামা কিনলি? বেশ মানিয়েছে। গাড়িতে খুব ভিড় হয়েছিল?

হা। সবাই রংপুরে সিনেমা দেখতে এলো, তাই।

একেবারে ঘেমে গেছিস।

বলতে বলতে বাবা তার মুখ হাত দিয়ে মুছিয়ে দেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে থাকেন কে কি পরেছে আজ, কি করছে, ঈদ কেমন হলো। আনু বলে চলে, বড় আপা নীল শাড়িটা পরেছে। কিছুতেই পারব না। মা বলল তারপর। মেজ আপা একটা সবুজ, না কচি কলাপাতার মতো রং মা–র শাড়ি পরেছে। স্যাণ্ডেল কিনেছে নতুন, সাদা, চিকন দুফিতে। সেজ আপা বাক্স খুলে দেখে ওর ব্লাউজের ইস্ত্রী নষ্ট হয়ে গেছে, তাই কী মন খারাপ! আমি যখন আসি তখনো কিছু পরে নি।

আনু টের পায়, বাবা কল্পনার চোখ দিয়ে দেখছেন প্রত্যেককে। হাঁ করে গিলছেন তার কথাগুলো। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে সব। তখন আনু আরো বিশদ করে বলতে থাকে। এক কথা বারবার করে বলতে থাকে। কিছু বাদ দেয় না। একটা বলতে বলতে আরেকটা মনে পড়ে যায়, খেই হারায়, আবার প্রথম থেকে বলে। বাবা একটুও বাধা দেন না! তন্ময় হয়ে শোনেন। তাঁর চোখে মুখে ব্যথা মেশানো খুশি বেলা শেষের মেঘের মতো ছড়িয়ে থাকে। আস্তে আস্তে মুখটা কেমন দূরে সরে যায়। আনুর মনে হয়, দূর থেকে বাবার একটা বড় ছবি দেখছে আনু! সে আপনমনে বলে চলে। তারপর চুপ করে যায়। বাবা চুপ করে থাকেন। টুপ টুপ টুপ টুপ করে সময় বয়ে যায় যেন। একটা নদীর মতো, বৃষ্টির ফোঁটার মতো, প্যাঁচার চোখ দুটোর মতো। আনু হঠাৎ চোখ তুলে জিগ্যেস করে, তোমাদের বাইরে যেতে দ্যায়?

কেনরে?

ঈদের নামাজ পড়তে।

ভেতরেই মৌলবি সাহেব আসে। এখানে জামাত হয়।

আনু অবাক হয়ে যায় শুনে। হাঁ করে বাবার কথাগুলো শোনে। কল্পনা করতে চেষ্টা করে উঁচু পাঁচিল ঘেরা জেলের মধ্যে ঈদের নামাজটাকে। বাইরে থেকে কয়েকটা গাছের মাথা দেখা যায় শুধু। আনু কল্পনা করে থই পায় না। বাবা একটু পরে বলেন, আনু জেলের

মধ্যে একটা আলাদা দুনিয়া। ঠিক আল্লার দুনিয়ার মতো। কে কোথা থেকে এসেছে। নিজের স্বাধীনতা নেই। ওপর থেকে হুকুম হচ্ছে, সেই মোতাবেক কাজ করে চলেছে সবাই। যা দেয় তাই খেতে হয়। যা করতে বলে, তাই। নিজের ইচ্ছার কোনো শক্তি নেই। আবার একদিন হুকুম আসে, ছাড়া পেয়ে যায়। ঠিক দুনিয়াদারির মতো। হায়াৎ মওৎ, রেজেক, কাজকর্ম, সব যেমন আল্লার ইচ্ছায় হয়, তেমনি।

আনু আবছা আবছা বোঝে। বাবা মোহগ্রস্তের মতো কথাগুলো বলে চলেন। কি প্রসঙ্গ, কেন বলা, সে বুঝবে কিনা, কিছুই যেন তিনি ভাবছেন না। কেবল বলতে হবে, এই বোধটা থেকে বলছেন। আনু বুঝতে পারে না; কিন্তু কোথায় যেন কষ্ট হয় তার! মনটা ভারী উদাস হয়ে আসে। সব আনন্দ, হাসি, রোদ, অর্থহীন মনে হয়। যেন সবকিছু তাকে স্পর্শ না করে তার বাইরে বিরাট একটা চাকার মতো ঘুরছে। তার দুঃখ হয় না, কান্না পায় না, বাবা তার হাত ধরে আছেন, সে হাতটাও যেন আর বোঝা যায় না।

বেরিয়ে এসে কেমন শূন্য লাগে ভেতরটা। সে হাঁটতে থাকে। পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে মোটরে তেল ভরা দেখে আনু। ঝরঝর শব্দ করে লেখা উঠছে এক–দুই–তিন কতটা পেট্রোল যাচ্ছে। ফুটপাথের ওপর দুটো লোক কোলাকুলি করছে। সিল্কের টুপি মাথায় বাচ্চা একটা ছেলে তার বাবার হাত ধরে কোথায় যাচ্ছে। ছেলেটা হাঁটতে পারছে না ঢিলে, বড়সড় নতুন কাপড়ের ভারে, টলমল করছে। রিকশার খুদে হর্ণ বিকট শব্দ করছে ঘ্যাঁ–পুঁ–ঘ্যাঁ–পুঁ। চাঁদোয়া টানানো রঙ্গিন শরবতের দোকানে ভিড় করে লোক বসেছে। বেঞ্চিতে। হাতে গেলাস নিয়ে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে। নেবুর ঘ্রাণ বেরিয়েছে ভারী দাশ কোম্পানিতে গিয়ে বসে আনু। সিনেমা দেখে বুলু ভাই এখানে

আসবে। এখানে থাকতে বলে গেছে তাকে। হিন্দুর দোকান। ওদের তো আর ঈদ না। তাই দোকানটা কেমন দেখাচ্ছে আজ। কুর্তি নেই, রঙিন কাগজের মালা নেই, হৈচৈ নেই—-একেবারে ঠাণ্ডা, অন্ধকার।

দাশবাবু বললেন, কী খোকা! বাবার সঙ্গে দেখা হলো? কেমন আছেন?

হ্যাঁ, ভালো।

বোসো তুমি। ঐখানটায় বোসো।

বলেই আবার কাজে লেগে গেলেন দাশবাবু। একটা কলের গান মেরামত করছেন তিনি। আনু তন্ময় হয়ে তাঁর কাজ করা দেখে। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসে। বুলু ভাই আসে। মহিমপুরের গাড়ি আটটায় ছাড়ে। বুলু ভাই বলে, টাউন হলে বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছে। যাবি? গাড়ির আগেই চলে আসব।

আসলে নাম তার ভার্জিনিয়া দাস। সেই থেকে জিনি সিস্টার। আনু শুনেছে মেজ আপার কাছে। মেজ আপার সঙ্গে ভারী ভাব হয়ে গেছে জিনি সিস্টারের। একদিন আনু নিয়ে গিয়েছিল বেড়াতে, বলে দিয়েছিলেন উনি। তারপর থেকে আর কোনদিন না হোক রোববারে মেজ আপা যাবেই। বলে দিয়েছিলেন সবাইকে নিয়ে যেতে। কিন্তু বড় আপা আজকাল বেরোয়ই না। মা বলেন, আমার আবার বেড়ানো? সেজ আপার প্রথম দিনই

পছন্দ হয়নি জিনি সিস্টারকে। সেজ আপাও প্রথম দিন গিয়েছিল আনুর সঙ্গে। ফিরে এসে বলে, মাগো। কালো কুষ্টি। তার ওপর আবার চশমা। দেখলে গা জারিয়ে আসে।

মেজ আপা তাকে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, থাক আর তোকে গীত গাইতে হবে না। নিজে যা একখানা সুন্দরী, আয়নায় সুরত দেখিস।

আনু বুঝেই পায় না সেজ আপার এত অপছন্দ কেন। রাতে মেজ আপাকে সে চুপ করে বলে, জানিস, সেজ আপা আরো কী সব খারাপ কথা বলে। মাকে বলেছিল।

বলুকগে। আমার কী বাবা।

রোববারে যাওয়া চাই–ই মেজ আপার। মিশনের মেয়েগুলো ভোরে নেয়ে উঠে ঝকমক করে। পিঠের ওপর ছড়িয়ে দেয় চুল। থালায় করে ফুল নিয়ে গীর্জা ঘরে যায়। বেদি সাজায়। তারপর প্রার্থনা শুরু হয়। জিনি সিসটারের বাবা জন দাস পাদ্রী। তিনি গিয়ে বেদিতে দাঁড়ান। বক্তৃতা দেন। সাধু ভাষায় যখন কথা বলতে থাকেন এত মজা লাগে আনুর।

“একশত মেষের ভিতর নিরানব্বইটি গৃহে ফিরিয়া আসিলেও যে একটি প্রত্যাবর্তন করে নাই, রাখাল বালক তাহার নিমিত্ত গৃহ হইতে অন্ধকার অরণ্যসংকুল পথে বাহির হয়। এবং উচ্চস্বরে রোদন করিয়া ডাকিতে থাকে।“

তারপর বেজে ওঠে অর্গ্যান। গমগমে হয় ওঠে সারা গীর্জাঘর। মনে হয় শাদা দুধে কে যেন সমস্ত ভাসিয়ে ধুয়ে নির্মল করে দিয়ে যাচ্ছে। একসাথে ছেলেমেয়েরা গেয়ে ওঠে—-"শান্তিময় তোমার কোলে ডাকিয়া লও মোরে।" বারবার করে গায়। আবেগে মন্থর গম্ভীর শোনায় সম্মিলিত গলা। সুরের কাঁপনে বুকের মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়। কেমন জড়িয়ে আসে সবকিছু। যেন বাস্তব থেকে স্বপ্নের দিকে দেবদূতের আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ি, ঘর, মানুষ, প্রকৃতি সবকিছু।

মিষ্টি খেতে দেন জিনি সিস্টার। এই গান আর মিষ্টির লোভে আনু রোববারে আসে। সারাক্ষণ মেজ আপা গল্প করতে থাকেন। ঘরের ভেতরে যান। আবার আনুকে বসিয়ে রেখে মেয়েদের ঘরে গিয়ে গল্প করেন। আনু বসে বসে দেখে সামনের চালাঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাইবেলের গল্প বলছেন জিনি সিস্টার। ছবি দেখাচ্ছেন। একটা ছবি আনুর খুব ভালো লেগেছিল। যিশুখৃষ্ট ইদারার পাড়ে একটা মেয়ের কলসি থেকে আজলা ভরে পানি খাচ্ছেন। বেলা দশটা এগারোটা হয়ে গেলে তখন ওরা ফেরে। মা বকেন, তবু যাওয়ার কামাই হয় না। সেজ আপা টিটকিরি কাটেন, তবু মেজ আপার যাওয়া চাইই।

একদিন মেজ আপা বাসায় এসে মাকে বললেন, মা আমি মাস্টারি নিলাম।

শুনে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না মা। তখন মেজ আপা আবার বললেন, বিশদ করে। সর্বজয়া গার্লস স্কুলে ছাত্রীদের পড়বে। এখন মাসে পঁচাত্তর আর দশ টাকা অ্যালাউন্স দেবে! এতক্ষণে আনু বুঝতে পারে এইজন্যে আজ মিশনারী থেকে ফিরে

আসবার সময় এত খুশি লাগছিল মেজ আপাকে। সে বলে, জিনি সিস্টার দিয়েছে চাকরি, না?

দেবে কি? আমি চেয়ে নিলাম। বাসায় বসে থেকে করব কি? পড়া তো আর হবে না। তবু দুটো টাকা এলে কাজে লাগবে।

মা জিগ্যেস করলেন, মাইনে কত বললি?

সব মিলিয়ে পঁচাশি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তখন তিনি বললেন, দ্যাখো আমার কপাল। মেয়ে হলো ছেলের সমান। এমন মা যেন সাতজন্মে কেউ না পায়।

থাক ও কথা মা।

মেজ আপা মা-র হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে সেইটে করতে করতে বলে। আবার বলে, রোজ ভোর সাতটায় যেতে হবে। ফিরতে ফিরতে একটা। দাই এসে নিয়ে যাবে।

সেই সময়ে বড় আপা এলেন ঘরে। মা তার মুখের দিকে তাকালেন। কেমন নিরস কণ্ঠে তাকে শোনালেন, শুনলি, ও মাস্টারী নিয়েছে। মাসে পঁচাশি টাকা মাইনে।

চোখ বড় করে বড় আপা তাকিয়ে থাকেন মেজ আপার দিকে। মুখে একটু পর বলেন, ভালো তো।

তারপর নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে যান। আনু বুঝতে পারে, শুনে বড় আপা কোথায় যেন কষ্ট পেয়েছেন। মা যেন টাকার কথাটা শুনিয়ে শুনিয়েই বললেন বড় আপাকে। অমন করে না বললে কী হতো? আনুর খুব রাগ হয় মা-র ওপর। মা আজকাল কী রকম যেন হয়ে যাচ্ছেন। এই সেদিন স্কুল থেকে বাসায় এসে শোনে বড় আপাকে বকছেন, বাপকে জেলে পাঠালি তাতে শান্তি নাই। এখন আমার হাড়মাংস চিবিয়ে খা, তাহলে পেট ভরবে। যমেও পছন্দ করে না তোকে?

ঘরে ঢুকে দেখে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন বড় আপা। আনু সাহসই পেল না তার কাছে যাবার। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে বাইরে চলে যাচ্ছিল, মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ইস্কুল থেকে এসে কোথায় চললি টো টো করতে। দাঁড়াও আজ তোমার একদিন কী আমার একদিন।

আনু রুখে দাঁড়িয়েছিল। ইস, তাকে মারবে এত শস্তা?

আনু উঠে দাঁড়ায়। মেজ আপা আর মা গল্প করতে থাকেন। স্কুলে চাকরি নেয়ার কথা শুনে আনুর কেমন খুশি হচ্ছিল, সেই খুশিটাও ম্লান হয়ে যায়। শোয়ার ঘরে এলে দেখে বড় আপা বসে গেছেন সেলাই নিয়ে। সুঁচে সুতো পরাচ্ছেন। আনু তার বিছানায় গিয়ে

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর একসময় মুখ ফিরিয়ে বলল, তুই মন খারাপ করিস না। আমার ভালো লাগে না।

বড় আপা চকিতে মুখ তুলে তাকান। আনুকে দেখেন। তারপর মুখখানা হাসিমাখা করে সুতো টানতে টানতে বলেন, কই মন খারাপ করি রে? কই?

আনু আর কিছু বলে না। মুখ ফিরিয়ে নেয়। বড় আপা জোর করে হাসতে চেয়েছে। তাই আরো কেমন করুণ লাগছে। তাকিয়ে দেখা যায় না।

সেজ আপা শুনে ঠোঁট উলটে বললেন, ও তো খ্রিষ্টান হয়ে গেছে, তাই ওকে নিয়েছে। মা একটা বোকা, তাই খুশি কত তার। আমাকে কেটে ফেললেও যেতাম না বাবা।

আনুর কেমন সন্দেহ হয় শুনে। তবু সে ধমকে ওঠে, হিংসা হচ্ছে কিনা, তাই।

মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে আনুর, সত্যি মেজ আপা খ্রিষ্টান হয়ে গেছে নাকি?

সেজ আপা আবার বললেন। তুই খোঁজ নিয়ে দেখগে, ওদের সব মাস্টারনী খৃষ্টান। একটা মোসলমান নেবে কিনা? কত দায় পড়েছে তাদের।

পরদিন আনু ভোরে মেজ আপাকে দিয়ে এলো স্কুলে। আজ দাই আসবে না। পথে জিগ্যেস করল সে, তুই খ্রিষ্টান হয়ে গেছিস আপা?

কে বলল রে?

এমনি। বল না? ওদের সব মাস্টারনী খ্রিষ্টান?

হ্যাঁ, কি হয়েছে?

তাহলে তোকে নিল কেন? মোসলমান নেয়?

নেবে না কেন? ওদের কত দরকার। এত খ্রিষ্টান পাবে কোথায়? জিনি সিস্টার কত ভালো দেখিস না।

তবু কেমন খচ খচ্ করে ভেতরটা। আর কিছু জিগ্যেস করে না সে। তার যেন মনে হয় সবাই কেমন দূরে সরে যাচ্ছে। মা, বড় আপা, মেজ আপা, সেজ আপা—- সবাই বদলে যাচ্ছেন। কি যেন একেকজনের ভেতরে ভেতরে হয়, আনু তার কিসসু জানতে পারে না। ভারী একা লাগে। কষ্ট হয়। কাউকে বলতে পারে না।

হঠাৎ মাস্টার সাহেবের কথা মনে পড়ে তার। নদীর পাড়ে সেদিন সন্ধ্যেটার ছবি ফিরে আসে। নদীর দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন—-তুমি যখন বড় হবে, তখন বুঝবে। আনুর মনে হয়, সে বড় হয়ে গেছে। সে এখন সব বোঝে। স্কুলের দরোজায় সুবিনয়কে দেখে সে। বলে ওঠে, ঐ তো দারোয়ান। আমি যাই।

মেজ আপা টিনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে যান।

এখন থেকে রোজ সকালে দাই এসে নিয়ে যায় তাঁকে। কত ভোরে ওঠেন মেজ আপা। তারো আগে মা উঠে রুটি বানাতে থাকে। চা দিয়ে রুটি খেয়ে মেজ আপা চলে যান ইস্কুলে। তারপর চা খেতে বসে সবাই। আনু আজকাল একা চা খায়। কাপটা নিয়ে চলে আসে বারান্দায়। বইগুলো পড়ে থাকে সামনে। রোদ উঠোনময় হয়ে যায়। কাক ডাকতে থাকে। বুলু ভাইদের বাড়িতে কলরব শোনা যায়। একেকদিন আনু খুব মন দিয়ে পড়ে। আবার একেক দিন কী হয় তার কিস্‌সু ভালো লাগে না। বসে বসে ছিপটা পাকা করে। টোপ বানায়। আজ কোথায় মাছ ধরতে যাবে, তাই ভাবে।

মা চিৎকার করে উঠেন, ওরে তোর চোদ্দ পুরুষ মাঝি ছিল কিনা। তুই ধরবি না তো কে ধরবে? মাছ ধরবি আর বাজারে বিক্রি করবি। লেখাপড়ার কি দরকার?

পালটা জবাব দেয় আনু, আমার বই নেই তো, আমি কি করব! দুখানা বই সাত টাকা লাগে। দিলেই হয়।

মা থামবেন কেন? তিনিও বলে চলেন, সাত টাকার জন্যে তোমার বিদ্যার জাহাজ ভাসে না, না? গরিবের ছেলে লেখাপড়া করে না? চেয়ে চিন্তে বই পড়ে না তারা? বই নাই তো এদ্দিন পরে বললি কেন? খবরদার বলতে পারবি না? যা আমার চোখের সামনে থেকে। যা সব, যা। গুষ্টি দূর হ।

আনু একটু ভয়ই পেয়ে যায়। ভয় পাবে না? মা-র চিৎকার শুনে আপারা পর্যন্ত গুটিগুটি পায়ে সরে পড়েছে। ছিপটা হাতে করে আনু বাইরে এসে দাঁড়ায়। যাক চুলোয়, আজ সে স্কুলেই যাবে না।

পরদিন সাতটা টাকা দেন মেজ আপা। বাসায় এসে সালু আপার কাছে সব শুনেছেন তিনি। আমাকে আগে বলিস নি কেন?

মাথায় হাত দিয়ে একটু পরে বলেন, দাঁড়িয়ে থাকিস না। বই কিনে নিয়ে আয়।

আনু তবু নড়ে না। কালকের রাগ আজ কান্না হয়ে আসতে চাইছে। টাকাগুলো মুঠো করে ধরে রাখে। তখন মেজ আপা বলেন, আচ্ছা, বইয়ের নাম লিখে দে, আমি সুবিনয়কে দিয়ে আনিয়ে নেবখন।

রাতেই বই দুটো এসে যায়। সুবিনয় দিয়ে গেলে আনু বাতির সামনে ধরে নেড়ে চেড়ে দেখে। গন্ধ শোকে নতুন বইয়ের। তক্ষুণি মলাট করে ফেলে। মেজ আপা তার পাশে বসে। বলেন, কি এবার থেকে পড়বি তো?

আনু ঘাড় কাৎ করে। তারপর এদিক ওদিক দেখে ফিসফিস করে মেজ আপাকে বলে, আমাকে একজোড়া স্যাণ্ডেল কিনে দিবি?

১১. সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে আনু দেখে, বড় আপা শুয়ে আছেন। মাথার কাছে গেলাশে পানি ঢাকা। দেখে কেমন করে উঠল ভেতরটা। পাশে বসে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে? কিছু না।

তার কপালে হাত দিয়ে দেখে জ্বর। বলল, জ্বর তো।

সেরে যাবে।

তখন একটু স্বস্তি পেল যেন আনু। না, তেমন কিছু নয়। একটু গা গরম শুধু। বসে বসে সে স্কুলের গল্প করল। বলল, বৃত্তি পরীক্ষা কাছে চলে এসেছে কিনা, তাই এখন ক্লাশে খুব পড়াচ্ছে। হেড মাস্টার তাকে ডেকে নিয়ে, ভালো করে পড়তে বলেছেন। বলেছেন, চেষ্টা করলে আনু বৃত্তি পেয়ে যেতে পারে। বড় আপা তার হাত ধরে উজ্জ্বল মুখ করে বলে উঠলেন, তাহলে বেশ ভালো হয়, নারে? তুই পড়।

সেই অসুখ আর কিছুতে কমল না। জ্বরটা বেড়েই চলল। মাঝখানে আনু একদিন হাসপাতাল থেকে ওধুধ এনে দিয়েছিল। কিস্‌সু কাজ হয় নি তাতে। বুলু ভাইর মা এসে সবাইকে খুব বকলেন, কী আক্কেল তোমাদের! এমন শক্ত অসুখ, হাসপাতালের ওপর ভরসা করে আছো। পরদিন সকালে বুলু ভাইর সঙ্গে গিয়ে আনু ডাক্তার নিয়ে এলো।

হাফপ্যান্ট পরে মাথায় হ্যাঁট চাপিয়ে সাইকেলে করে এলেন ডাক্তার নিয়োগী। পরীক্ষা করে বলে গেলেন টাইফয়েড।

আনু তার সঙ্গে সঙ্গে গেল ডিসপেনসারী। ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরল। বলল, ডাক্তার খুব সাবধানে থাকতে বলেছে।

আনু এখন আর খেলতে যায় না, মাছ ধরতে যাওয়াটাও বন্ধ করে দিয়েছে। আজকাল কিছুই যেন ভালো লাগে না তার। বড় আপার অসুখ বলে নয়, সামনে বৃত্তি পরীক্ষা বলেও নয়, এমনিতে। সে নিজেই বুঝতে পারে না, তার কি হয়ে গেছে। মনটা যেন এখানে নেই, কিংবা কোথাও। একটা উড়ে চলার, দূরে চলে যাওয়ার, হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে যেন ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠতে চায়। চারপাশের সমস্ত কিছু এত দূরের মনে হয়–নিস্পৃহতায় ভরে থাকে মন। বড় উদাস মনে হয়।

স্কুলে বসে থাকতেও ভালো লাগে না। একদিন সে স্কুলেই গেল না। বইখাতা নিয়ে বেরুলো, বেরিয়ে গিয়ে নদীর পাড়ে যেখানে খেপাড় হয়, ছোট্ট একটা বাজার মতো যেখানে, সেখানে বসে রইলো। আবার সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ধরলো রেললাইন। রেললাইন দিয়ে ইস্টিশানে এলো। দুপুর বারোটার ট্রেন আসবে এখন। খবর কাগজ আসবে। একটু পরেই হকার কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে বসবে, তাকে খুলবার সময় পর্যন্ত দেবে না, সবাই ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কাড়াকাড়ি করবে কাগজের জন্যে।

আনু বসে বসে ভিড় দেখতে লাগল। বটগাছের নিচে টমটম তিনটে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়াগুলো মাটিতে পা ঠুকছে, গা কাঁপিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। মিষ্টির দোকানে গ্রামোফন বাজছে। উলিপুরের বাস এসে গেছে। আবার প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাবে উলিপুর। ড্রাইভার পানি খাওয়াচ্ছে ইঞ্জিনের বনাট তুলে। আনুর মনে হয়, সেও যদি কোথাও চলে যেতে পারতো তো ভালো হতো। বড় আপা জ্বরের ঘোরে এখন পড়ে আছেন বিছানায়। মার রান্না বোধহয় শেষ হয়নি। সেজ আপা নাইতে গেছেন নিশ্চয়। আনু হাই তোলে। তার এখানেও ভালো লাগছে না। সে উঠতে যাবে, এমন সময় মাটি কাঁপিয়ে, চারদিক চঞ্চল করে ফুসতে ফুসতে ট্রেন এসে দাঁড়াল। হৈহৈ করে লোকেরা নামছে, কুলিরা চিৎকার করছে, বৌ-ছেলেমেয়েরা হাঁটতে পারছে না, তবু দৌচ্ছে খালি গাড়ির দিকে, গেটের কাছে চেকার দাঁড়িয়ে গেছে। আনু গিয়ে গাড়িতে বসলো।

ট্রেন ছেড়ে দিল। সড়াৎ করে বেরিয়ে গেল মহিমপুরের প্ল্যাটফরম, মালগুদাম, স্টেশন মাস্টারের বাড়ি। এ হলো মাঠ, মাঠ শেষে জলা জায়গাটা, তারপর গ্রামের মধ্যে নেমে গেল ট্রেন। আনুর বুকের ভেতরটা ছমছম করে উঠছে, তবু ভালো লাগছে। কোথাও যাবার নেই, তবু সে কোথাও যাচ্ছে। মুখে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছে। রোদে ঝকঝকে দেখাচ্ছে আকাশ, মাঠ, ধানক্ষেত, চিল, সাদা বক, মাছরাঙা, পানি সেঁচার চড়ক। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে টোগরাই হাটের ব্রীজ। ব্রীজের নিচে একদিন মাছ ধরতে যাবে আনু। ওখানে ভালো মাছ পাওয়া যায়। বড় আপা বেলেমাছ যা ভালোবাসে। বেলেমাছ ধরে আনবে আনু।

ব্রীজের নিচে কাঁচের মত স্বচ্ছ পানি। পেরিয়ে গিয়ে আবার ধানক্ষেত। রেললাইনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তাটা। যেন অন্তহীন একটা ফিতে কেবলই খুলে যাচ্ছে। আনুর ঘুম পাচ্ছে খুব। সে কাৎ হয়ে বইখাতা কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর আর কিছু মনে থাকে না।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখে, আরে তিস্তা এসে গেছে। তিস্তা জংশন। চোখ কচলে তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে। এ গাড়ি এখানেই থাকবে। তারপর বিকেলে রংপুরের প্যাসেঞ্জার নিয়ে আবার ফিরে যাবে মহিমপুর। আনু লাফ দিয়ে নামে। কী বিরাট প্ল্যাটফরম তিস্তার। এ মাথা থেকে ও মাথা হাঁটলে পা ধরে আসতে চায়। ঐ শেষমাথায় দুটো বড় বড় কৃষ্ণচূড়া আর শিমুল ফুলের গাছ। তারপরে মাঝে খোলা শেড। ইঞ্জিনের পানি খাবার চোং ঝুলছে মাথার ওপর। আরো এগিয়ে এলে ওজন করবার কল। কলটার ঠিক পাশে নিচু সাইনবোর্ড। তাতে লেখা পার্বতীপুর লাইনে যাইবার জন্য গাড়ি বদল করুন। আরো খানিকটা হাঁটলে ইস্টিশান। ইস্টিশানের দুদিকে মুখ। একদিকে মহিমপুর থেকে গাড়ি এসে দাঁড়ায়, আরেকদিকে রংপুর থেকে, কাউনিয়া থেকে, লালমনিরহাট থেকে। ওয়েটিং রুমে শেতলপাটির টানা পাখা ঝুলছে। স্টেশন মাস্টারের ঘরে মাস্টার সাহেব খবর কাগজ পড়ছেন। এদিকের ঘরে টেলিফোনের সব চৌকো বাক্স বসানো। ইস্টিশান ঘরের পরে ইদারা। লোহার শেকল বাঁধা বালতি থেকে পানি খাচ্ছে যাত্রীরা। তারপর সোজা হেঁটে গেলে একেবারে শেষ মাথায় দোতলা উঁচু ছোট্ট একটা ঘর। গায়ে বড় বড় করে লেখা সাউথ কেবিন। ওখান থেকে সিগন্যাল ওঠায়, নামায়; আবার টেলিফোনে কথা বলে। সেখান থেকে দেখা যায় তিস্তা ব্রীজ। রোদে তার রংটা গোলাপি দেখায় একটা অতিকায় খেলনার মতো লাগে। রংপুর যেতে

কতবার আনু ব্রীজটার ওপর দিয়ে গেছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছে। ব্রীজের ত্রিভুজগুলো গুনবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এত জোরে চলে গাড়ি, কোনদিনই সঠিক গুনতে পারেনি। আজ মনে হলো হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় ব্রীজটার কাছে। তার মনের মধ্যে ভারী রোমাঞ্চ হয়। যে ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়ি করে গেছে, সেটাই সে পায়ে হেঁটে পার হবে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবে।

হাঁটতে থাকে আনু। মাথার ওপরে চড়া রোদ। গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছে। কাক ডাকছে। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। টেলিগ্রাফের মেলা তার মাথার ওপরে। বাতাস লেগে মিষ্টি একটা বাজনার মতো শব্দ উঠছে তার থেকে। আনু একটু জিরিয়ে আবার এগোয়। ইস্ কতদূর। ইস্টিশান থেকে ব্রীজটা যতটুকু দেখা গিয়েছিল এখনো ঠিক ততটুকুই লাগছে। ঠিক যেন পাহাড়ের মতো। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখতো আনু, বাবার সঙ্গে। বাবা বলতেন, পাহাড় মনে হয় কাছে, যতদূর যাবি পাহাড়ও ততদূর সরে যাবে।

আর যেন পারে না আনু। কিন্তু কেমন একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাকে। ট্রেন, ইস্টিশান, সিগন্যাল, ব্রীজ—- সব যেন তার স্বপ্নের দেশ থেকে আসে। বুকের মধ্যে এমন একটা নিবিড় টান অনুভব করে সে চিরকাল। সে যদি সারাজীবন গাড়িতে গাড়িতে ঘুরতে পারত, হাঁটতে পারত কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফরমে, এই রকম রোদে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রাম তারে বাতাসের বাজনা শুনতে পারতো। এখানে দুঃখ নেই, অভাব নেই, অসুখ নেই—- শুধু একটা স্থির হয়ে থাকা আনন্দ কেবল। আনু জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। ব্রীজটার কাছে সে পৌঁছুবেই।

পায়ের নিচে তেতে উঠেছে নুড়িগুলো। স্লিপার লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আনু। দশ বারোটা লাইন এই খানে কাটাকুটি হয়ে ছড়িয়ে গেছে। একটা ধাঁধার মতো লাগছে। একসময়ে সে। পৌঁছে যায় তিস্তা ব্রীজে।

তখন আর গোটা ব্রীজটা দেখা যায় না। তার সমুখে অতিকায় গেটের ঠ্যাংয়ের মতো লোহার বরগা দুদিকে উঠে গেছে। চূড়োটা দেখতে হলে মাথা ঘাড়ের সঙ্গে ঠেকে যায়। লাল টকটকে রংটা সূর্যের হলকা থেকে তৈরি হয়েছে যেন। হাত দেয়া যায় না, হাত পুড়ে যায়। ব্রীজের ওপর রেললাইন চলে গেছে, পাশে পায়ে হাঁটবার পথ। আবার ট্রেন এলে সরে দাঁড়াবার জন্যে মাঝে মাঝে রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া গোল একটু জায়গা। ইটের মোটা থামগুলো নেমে গেছে নদীর ভেতরে। যেখানে নেমেছে, তার চারপাশে অবোধ একটা ছেলের মতো পানি ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে আবার বয়ে যাচ্ছে। একটা খামের নিচে বড় পাথরের চাইয়ের ওপর বসে মাছ ধরছে একটা লোক। মাথায় তার গামছা বাঁধা। ওপর। থেকে তার প্রসারিত হাত দুটো দেখা যায় শুধু।

গুনতে লাগল আনু। আজ সে গুনে দেখল মোট সতেরোটা ত্রিভুজ। একবারে শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়ায় সে। আবার ফিরে আসতে থাকে। পায়ের নিচে নদীটা কী বিশাল, মনে হয়। আকাশটা উপুড় হয়ে পড়েছে, নীলচে একটা রং লেগেছে–তাই কেমন যেন উদাস দেখায়। একটা নৌকা নেই, তাই মানুষ নেই, পাখি নেই খাঁ খাঁ করছে নদীর বুক। দূরে গুমগুম করে একটা শব্দ ওঠে।

আনু তাকিয়ে দেখে ট্রেন আসছে। তক্ষুনি সে রেলিং ঘেরা গোল জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। শক্ত করে ধরে থাকে। বুক কেঁপে ওঠে। পায়ের নিচে শিরশির করছে, কাঁপনটা বাড়ছে, শব্দটা ভীষণ হচ্ছে। গুমগুম করতে করতে ট্রেনটা তীরের মতো চলে আসছে, বড় হচ্ছে, কাছে। এলো। সড়াৎ সড়াৎ করে আকাশে বাতাসে ঢাকের কাঠি বাজিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা। তখন কাঁপুনিটা কমে গেল। আনু তাকিয়ে দেখে সে ঘেমে গেছে। আনু ভেবে দেখে, ট্রেনটা সে কিছুই দেখতে পায় নি। সে চোখ বন্ধ করে ছিল, খালি শব্দটা শুনেছে, তার গায়ের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো একটা বাতাস বয়ে গেছে।

ইস্টিশানে ফিরে এসে মেল-বাক্সের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে আনু। চারদিকের বাতাস থেকে একটা ঝিমোনো সুর এসে কানে ফিসফিস করে তার। স্টেশন মাস্টার বাসায় চলে গেছেন। টেলিফোনের বাক্সগুলো চুপ হয়ে গেছে। একটা লোক কোট ভাঁজ করে মাথার নিচে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। কোথায় একটা বাছা কাঁদছে। পানির ট্যাঙ্ক থেকে টপ্ টন্ টন্ টন্ করে চুঁইয়ে পড়ছে পানি।

আস্তে আস্তে কোমল হয়ে এলো রোদটা। ছায়াগুলো লম্বা হলো। রেললাইনের ওপর গিয়ে পড়ল ইস্টিশানের ছায়া। কৃষ্ণচূড়া আর শিমূলের ডালে শোনা গেল পাখিদের কলরব। আবার মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আবার বেজে উঠতে লাগল টেলিফোনের বাক্স। কুলিরা লণ্ঠনগুলো মাজতে লাগল, কাঁচ পরিষ্কার করল, তেল ভরল। টিভি স্টলে জমে উঠল ভীড়। মহিমপুরে যাবার জন্যে ফুসতে লাগল ইঞ্জিন। হেলতে দুলতে এসে হাজির হলেন গার্ড সাহেব। একটা পান কিনে খেলেন। আনু গিয়ে গাড়িতে উঠল।

মহিমপুরে বাত আটটায় পৌঁছুলো সে। তার ভয় করতে লাগল বাড়ির জন্যে, মার জন্যে। মা কি বলবেন তাকে? সারাদিন সে কোথায় ছিল? সারাদিন বাড়ির কথা একটুও মনে ছিল না তার। সে যেন একটা অন্য মানুষ এই সারাদিন ঘুরে বেরিয়েছে স্কুল পালিয়ে আর যে আনু বাসায় ফিরছে সে যেন মরে ছিল সারাদিন,সন্ধ্যের সময় আবার জেগে উঠেছে। পায়ে পায়ে ফিরে আসে সে। মনে মনে একটা গল্প বানায়। বলবে বৃত্তি পরীক্ষার পড়া বুঝতে গিয়েছিল ক্লাশের একটা ছেলের বাড়িতে। বলবে সেই ছেলেটার প্রাইভেট মাস্টারের কাছে সে আজ থেকে পড়ছে, হেডমাস্টাব বলে দিয়েছেন, তার পয়সা লাগবে না। বলবে হেডমাস্টার তাকে খুব ভালোবাসেন।

বাসায় এসে দেখে জিনি সিস্টার এসেছেন। বড় আপার মাথার কাছে বসে আছেন। পায়ের কাছে বসেছেন মেজ আপা। সালু আপা আর মিনু আপা বারান্দায় চুপ করে বসে আছে অন্ধকারে। ঘর থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে তাদের মুখে। জিনি সিস্টার তাকে দেখে বললেন, এসো।

সে জিগ্যেস করলো, ভালো আছেন?

তুমি আজকাল আর যাও না যে?

আমার বৃত্তি পরীক্ষা।

বড় আপা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে কি জেগে তা বোঝা যাচ্ছে না। সেদিকে আড় চোখে একবার তাকাল আনু। বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে আছেন। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় আরো শীর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। মেজ আপা বললেন, সারাদিন কোথায় থাকিস?

আনু সে কথার জবাব না দিয়ে রান্নাঘরে এলো। সেখানে সেজ আপা মা-র কাছে বসে। আজ তিনি রান্না করছেন। মা চোখ মুছছেন। মা আনুকে দেখে বললেন, নিচু গলায়, যেন শোনাই গেল না, এই এলি! ফতেমা আজ কেমন করছে দেখগে।

ধক করে উঠলো আজ আনুর বুকের ভেতরটা। অসুখটা আবার বেড়েছে? সে কী করবে বুঝতে পারল না। বলল, ডাক্তার আসেনি।

বুলুকে দিয়ে ডাকালাম।

মা আবার চোখ মুছলেন। আনু বেরিয়ে এলো বাইরে। বড় আপার কাছে যেতে পারল না। জিনি সিস্টার বসে আছেন; তার লজ্জা করল কেমন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। তার দম যে ফুরিয়ে যেতে চাইছে। সে নড়ল না। একটা কুকুর মানুষের বাচ্চার মতো কেঁদে উঠলো কোথায়। বুলু ভাই এসে তার হাত ধরল একটা কথা না বলে। যেন, দুজনে দাঁড়িয়ে আছে, কে আসবে, কার আসবার কথা আছে।

রাতে বড় আপার কাছে এলো আনু। জিনি সিস্টার চলে গেছেন অনেকক্ষণ। সবাই খেতে বসেছে। কেবল মিনু আপা বসে আছেন পায়ের কাছে। আনুর এতক্ষণ আসতে

সংকোচ করছিল। কেমন একটা অপরাধ বোধ তাকে দংশে মারছিল। সারাদিন সে বেড়িয়েছে, আর বড় আপার অসুখ বেড়েছে এদিকে একবারও তার মনে হয়নি বাড়ির কথা। মাথা নিচু করে পাশে বসলো সে চোরের মতো। বড় আপা চোখ মেললেন। তখন ব্রিতবোধ করল আনু। সে একটা কথা বলতে পারল না। বিছানার চাঁদর খুঁটতে লাগল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে। বড় আপা তাকে দেখে যেন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, বাবাকে দেখতে যাবি না আনু? বাবাকে আসতে বলিস।

পরদিন ভোরে, সূর্য ওঠার অনেক আগে বড় আপা মারা গেলেন।

সে কাঁদলো না। যেন তার জানাই ছিল সব। মা-র করুণ কান্নার পটভূমিতে সে তন্ময় হয়ে মনের মধ্যে দেখতে লাগল দুপুরের রোদে পুড়ে যাওয়া লাল টকটকে তিস্তা ব্রীজ।

কুড়িগ্রাম ও ঢাকা
জানুয়ারি ১৯৫৭